ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه أجمعين.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার, তাই আমরা সবাই তারই প্রশংসা করি। আর সকল ধরনের সাহায্য আমরা তার নিকটই চাই, আমরা তাঁর কাছেই হেদায়েত চাই। কু-প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে যে কোন মন্দ কার্য সম্পাদন করা থেকে বাঁচতে আমরা তারই কাছে আশ্রয় চাই। তিনি হেদায়েতের মালিক। যাকে তিনি হেদায়েত দেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর যাকে হেদায়েতের সন্ধান না দেন কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর বিশেষ রহমত নাযিল হোক তার উপর ও তার পরিবার-পরিজনের ওপর এবং তাঁর সঙ্গী-সাথি ও সমস্ত মুসলমানের ওপর। মহাত্মা সাহাবাদের ইতিহাস অধ্যয়নের পূর্বে তাদের সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ধর্মীয় বিশ্বাস কি? তা জেনে নেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা তাদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা না রেখে তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন, পথভ্রষ্ট আর বিপথগামিতার কারণ। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের প্রতিটি কিতাবে এর সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। তারা আকীদার বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সব কিতাব লিখেছেন তন্মধ্যে এমন কোন কিতাব নেই যাতে সাহাবা সম্পর্কে আকীদার উল্লেখ নেই। যেমন আল্লামা আল-কালায়ী লিখিত কিতাব شرح أصول السنة আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল লিখিত السنة ইবনে আবি আছেম লিখিত اعتقاد أهل السنة ইবনে আবি বত্বা লিখিত الإبانة আল্লামা সাবুনি লিখিত عقيدة السلف لأصحاب الحديث ইত্যাদি। বরং সত্যের অনুসারী আলেম যখনই আকীদা বিষয়ে পদার্পণ করেন যদিও তার লিখনির পরিমাণ স্বল্প হয় তথাপিও সাহার সম্পর্কে আলোকপাত করেন। হয় তাদের সকলের মর্যাদা বর্ণনার মাধ্যমে, না হয় শুধু খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা বর্ণনার মাধ্যমে অথবা তাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠার বর্ণনার মাধ্যমে বা তাদেরকে গালি গালাজ ও অপবাদ দেওয়া থেকে নিষেধের মাধ্যমে। বা তাদের মাঝে সৃষ্ট কলহ বিবাদ দ্বারা তাদেরকে কষ্ট পৌঁছান থেকে বিরত থাকার আহ্বানের মাধ্যমে। যেহেতু মনীষীগণ আকীদার বিষয়াদি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন তাই আমি আমার আলোচনাকে শুধু সাহাবাদের ইতিহাস পর্যালোচনার জন্য যতটুকু (তাদের সম্পর্কে) বিশুদ্ধ আকীদার প্রয়োজন তন্মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। তবে বিশেষ প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আসতে পারে, যেমন গালি দিলে তার বিধান কি? এবং সাহাবীদের সম্পর্কে সাহাবাদিগকে বর্ণিত ইতিহাসের তথ্য পর্যালোচনা ইত্যাদি। সাহাবা সম্পর্কে আমার এ পর্যালোচনা ইতিহাসবিদ ও সাহাবা সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তাদের মতাদর্শ সম্পর্কে পর্যালোচকদের জন্য অত্যন্ত জরুরি এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্যও অত্যন্ত ফলদায়ক মনে করি, যারা কোন সাহাবার চরিত্র সম্পর্কে গবেষণা করতে চায়। আর আমার এ আলোচনাকে আমি কয়েক ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমত: কুরআন ও হাদীস থেকে সাহাবাদের ন্যায়-পরায়ণতার প্রমাণাদি। এ ক্ষেত্রে আমি শুধু সেসব কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ গ্রহণ করেছি যেগুলো তাদের ইনসাফের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করার সাথে সাথে কিছু ইমামের মন্তব্যও উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয়ত: রাসূলের সাহচর্য, যার গুরুত্ব এত অপরিসীম যে, তার সাথে অন্য কিছুর তুলনাই চলে না। এ স্থানে আমি অন্য লোকদের ওপর সাহাবাদের মর্যাদা কেমন তা বর্ণনা করেছি। তৃতীয়ত: সাহাবাদিগকে গালি দেওয়ার প্রকারভেদ এবং যে কোন প্রকারের গালির হুকুম কি?—তার

বর্ণনা। যে সব গালি সাহাবাগণের ন্যায়পরায়ণতার ওপর আঘাত হানে, আর যে সব গালি তার ওপর আঘাত হানে না সেগুলোর মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করেছি। ঐ সব সাহাবাকে গালি দেওয়া যাদের সম্মান ধারাবাহিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আর যারা ঐ রকম নয় তাদেরকে গালি দেওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে। এমনিভাবে যারা সবাইকে গালি দেয় আর যারা নির্দিষ্ট সাহাবাদেরকে গালি দেয় তার হুকুম আলোচনা করেছি। সর্বশেষ উল্লেখ করেছি, যে বিষয়ে মু'মিন জননী আয়েশা (রা.)-কে মহান আল্লাহ পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন যদি কেউ সে বিষয়ে তাঁকে অপবাদ দেয় তার হুকুম কি? এবং অন্য সব মু'মিন জননীদেরকে অপবাদ দেওয়ার বিধান কি?

চতুর্থত: সাহাবাগণকে গাল মন্দ বলার পরিণাম পরিণতি।

পঞ্চমত: সাহাবাদের মাঝে যে বিবাদ হয়েছে সে ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করা, এ ক্ষেত্রে আমি কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করেছি যারা সাহাবীদের মাঝে সৃষ্ট বিবাদ নিয়ে পর্যালোচনা করবে তাদের জন্য তা অত্যন্ত জরুরি, যাতে কোন সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন না থাকে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমি এ কথার দাবিদার নয় যে আমি নতুন কিছু আপনাদেরকে উপহার দিয়েছি, আমি শুধু বিজ্ঞ আলেমগণের নির্বাচিত বাক্য সমূহ একত্র করে সে গুলিকে নির্দিষ্ট কারুকার্যে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সাজিয়েছি, আর তা হল সাহাবা রা. সম্পর্কে নৈতিক ধ্যান-ধারণা এবং কোন ভাবেই যেন তাদের মানহানি না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকা। আর আমার এ পরিশ্রম আমার পূর্ব মনীষীদের পরিশ্রমের অংশ বিশেষ যারা আকীদা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়, ইতিহাস, ও হাদীস ইত্যাদির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মহান আল্লাহর সমীপে কায়মনে দরখাস্ত এই যে, তিনি যেন আমাদিগকে সাহাবীদের মুহাব্বত ও ভালোবাসা দান করেন ও তাদের দলভুক্ত করে কিয়ামতের ময়দানে উঠান। এবং তারই নিকট প্রার্থনা করি ভাল কাজের সক্ষমতা ও কর্মের নির্ভুলতার। আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার বর্গ ও সাহাবীগণের উপর।

সাহাবীগণের আদালত সম্পর্কে কুরআন হাদীসের প্রমাণাদি

সত্যিকারের মুসলমানদের নিকট সাহাবীদের আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা অকাট্য আকীদার বিষয়সমূহের একটি। কুরআন ও হাদীসে যার বহু প্রমাণ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. سورة الفتح ﴿١٨﴾

অর্থাৎ- আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (সূরা আল-ফাতাহ : ১৮)

জাবের রা. বর্ণনা করেন শপথে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের পরিমাণ (সংখ্যা) ছিল চৌদ্দ শত মাত্র। (বুখারী হাদীস নং ৪১৫৪)

বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে সাহাবীদের সাফাই গাওয়া হয়েছে। আর এ সাফাই এমন এক মহা সত্তার পক্ষ থেকে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়ে ভালভাবেই অবগত। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন উভয় ভাল বিধায় আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

(যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির শেষ আমলই নির্ভরযোগ্য তাই মহান আল্লাহ শুধু সে সব ব্যক্তির উপরই সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারেন যারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। যারা ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ না করবে তাদের প্রতি মহান আল্লাহ কখনো সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারেন না।) এ কথার সমর্থনে রাসূলের সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. (صحيح مسلم : ٢٤٩٤)

অর্থাৎ- "যারা বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণ করেছে তাদের কেউ, ইনশাআল্লাহ, জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি তাঁর স্থায়ী গুণাবলির একটি।

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি শুধু সে ব্যক্তির জন্য প্রকাশিত হতে পারে যে তার সন্তুষ্টির উপকরণাদি যথাযথভাবে পালন করবে। আর যার উপর একবার সন্তুষ্ট হবেন কখনো তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। সুতরাং যাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির শুভ সংবাদ এসেছে তাঁরা সকলই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি এ সন্তুষ্টি প্রকাশ ঈমান ও নেক আমল সম্পাদনের পরে হয়ে থাকে তাহলে এটা হবে তাদের প্রশংসা, আর আল্লাহর প্রশংসা সে ব্যক্তি কখনো পেতে পারে না যে পরক্ষণে মন্দ কাজ করবে, তিরস্কারের পাত্র হবে। কেননা আল্লাহ عالم الغيب অদৃশ্যের জ্ঞানী।

ইবনে রজব রহ. বলেন, মহান আল্লাহ যখন আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনি সাহাবীদের অন্তরের অবস্থা জানেন এবং তাদের উপর সন্তুষ্ট আছেন এবং তাদের উপর বিশেষ শান্তি অবতীর্ণ করেছেন তাই কোন ব্যক্তির জন্য উচিত নয় যে তাদের ব্যাপারে ইতস্তত করবে অথবা তাদের ব্যাপারে কোন সন্দেহ সংশয় করবে।

২নং আয়াত :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِّ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. سورة الفتح ﴿٢٩﴾

অর্থাৎ- মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা আল-ফাতাহ : ২৯)

ইমাম মালেক র. বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি যে সিরিয়া বিজয়ী সাহাবাগণ যখন খ্রিস্টানদের দৃষ্টি গোচর হলেন তখন তারা সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, আল্লাহর কসম এসব লোক মূসা আ. এর সহচর বর্গের তুলনায় অধিক উত্তম। বাস্তবেই তারা সত্যি বলেছে, কেননা পূর্ববর্তী সব কিতাবে এ কথার সুস্পষ্ট বর্ণা রয়েছে যে এ উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম উম্মত আর এদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হলেন রাসূলের সাহাবীগণ। তাই মহান আল্লাহ তাদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন মহা গ্রন্থ আল কুরআনে এবং বলেছেন যে তাদের পরিচয় রয়েছে অন্যান্য আসমানি কিতাবে। যেমন তাওরাতে ও ইঞ্জিলে। তাদের দৃষ্টান্তে মহান আল্লাহ বলেন كزرع أخرج شطأه এমন ফসল যা বহু ডাল পালা ছেড়েছে, فآزره যা কোমলের পর শক্ত হয়েছে। فاستغلظ যৌবনে পৌছাল বা বড় হল فاستوى على سوقه يعجب الزراع যা কাণ্ডের ওপর দাঁড়াল দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করল। ঠিক তেমনি অবস্থা রাসূলের সাহাবীদের। মহান আল্লাহ হীন ও দুর্বলতার অবস্থার পর তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। তিনি রাসূলকে তাদের বিষয়ে ঐ চাষীর সাথে তুলনা করেছেন যার ফসলে কিশলয় বের হয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সাহাবীদের এই বৃদ্ধি কাফের সম্প্রদায়ের গাত্রদাহের কারণ। আল্লামা ইবনুল কাইয়ূম জাওযী রহ. বলেন সাহাবীদের সম্পর্কে কুরআনে যে গুণ বর্ণিত হয়েছে তা সকল সাহাবীর জন্য। আর ইহাই সাধারণ মুসলমানদের অভিমত।

৩য় আয়াত

لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِّ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. ﴿١٠﴾ سورة الحشر

এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম। আর এ সম্পদ তাদের জন্য যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা আপনি দয়ালু পরম করুণাময়। (সূরা আল-হাশর : ৮-১০)

বর্ণিত আয়াতে মহান আল্লাহ সে সব লোকদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যারা যুদ্ধ লব্ধ মালের হকদার। আর তারা হলেন তিন প্রকার। ১ম দরিদ্র মুহাজির (মক্কা থেকে আগত) ২য় মদীনায় পূর্ব থেকে বসবাসকারী আনসারগণ। ৩য় পরবর্তীতে আগত সাধারণ মু'মিনগণ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মালেক রহ. অত্যন্ত সুন্দর মন্তব্য করেছেন তিনি বলেন এ আয়াত প্রমাণ করে যে, যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয় তারা যুদ্ধ লব্ধ মালের কোন অংশ পাবে না। কেননা যুদ্ধ লব্ধ মাল প্রাপ্যদের বৈশিষ্ট্য থেকে তারা বঞ্চিত। আর তাহল পূর্ববর্তীদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ পরিহার করত তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিশিষ্ট সাহাবী ছাআাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন সত্যিকারের মানুষের স্তর তিনটি তন্মধ্যে দুটি অতিবাহিত হয়েছে। বাকি আছে একটি। তাই তোমাদের জন্য উচিত তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। যারা আজও বিদ্যমান। অতঃপর তিনি সূরা হাশরের ৮নং আয়াত পাঠ করে বলেন, এটা হল মুহাজিরদের স্তর যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতঃপর ৯নং আয়াত পাঠকরে বললেন, এটা হল পূর্ব থেকে মদীনায় অবস্থানরত আনসারদের স্তর। তারাও অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তারপর তিনি ১০ নং আয়াত পাঠ করে বললেন, এটা হল পরবর্তী সত্যিকারের মুসলমানদের স্তর যা আজও বিদ্যমান। সুতরাং তোমরা যদি সমান অধিকারী হতে চাও তাহলে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাও এবং পূর্ববর্তীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। মুমিন জননী আয়েশা রা. বলেন, 'অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মহান প্রভুর নির্দেশ হয়েছে সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আর মানুষ তা না করে উল্টো তাদেরকে গাল মন্দ বলে।' (মুসলিম হাদীস নং : ৩০২২)

আবু নাঈম রা. বলেন ঐ ব্যক্তির চেয়ে হতভাগা আর কে, যে অবাধ্যতা আর বিরোধিতা দ্বারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করে অথচ আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তার সাহাবীদের প্রতি বিনয়ী হতে ও তাদের জন্য দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন—

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ .

سورة آل عمران ﴿١٥٩﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।" মহান আল্লাহ অন্যত্রে বলেন-

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. سورة الشعراء ﴿٢١٥﴾

"আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি সদয় হন" (সূরা আশ-শুআরা ২১৫)

সুতরাং যারা রাসূলের সাহাবীদেরকে গাল মন্দ করে ও তাদের যুদ্ধ বিগ্রহকে অশোভনীয় ভাষায় ব্যক্ত করে তারা সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী ও আল্লাহর শিক্ষা এবং উপদেশের বিরুদ্ধাচরণকারী বলে পরিগণিত হবে। সাহাবীদের ব্যাপারে শুধু তারাই অশোভনীয় মন্তব্য করতে পারে যাদের অন্তরাত্মা নবী রাসূল, সাহাবী ও সাধারণ মু'মিনদের ব্যাপারে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত।

মুজাহিদ র. সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন- তোমরা কখনো রাসূলের সহচরদেরকে মন্দ বলো না, কেননা মহান আল্লাহ তাদের পরবর্তী যুদ্ধ বিগ্রহের কথা জানা সত্বেও তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৪ র্থ আয়াত

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . سورة التوبة : ﴿١٠٠﴾

"যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবেন চিরকাল। এটাই হল মহা সাফল্য।" (সূরা আত-তাওবাহ ১০০)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন মহান আল্লাহ ঈমানে অগ্রগামীদের প্রতি নিঃশর্তে সন্তুষ্ট হয়েছেন আর পরবর্তীদের প্রতি এ শর্তে সন্তুষ্ট হয়েছেন যে তারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করবে। আর আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের অনুসরণের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে তাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

৫ম আয়াত

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى . سورة الحديد ﴿١٠﴾

"তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষায় যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। (সূরা আল-হাদীদ : ১০)

মুজাহিদ ও কাতাদা রা. বলেছেন এখানে الحسنى দ্বারা জান্নাত উদ্দেশ্য। ইবনে হাযম রহ. বর্ণিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছে যে কোন সাহাবী জাহান্নামে যাবেন না বরং প্রতিজন সাহাবী জান্নাতে প্রবেশ করবেন। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন وكلا وعد الله الحسنى অর্থাৎ—উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে।

৬ষ্ঠ আয়াত

لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سورة التوبة : ﴿١١٧﴾

নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়া পরবশ হন তাদের প্রতি, নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময় (সূরা আত-তাওবা : ১১৭)

বর্ণিত আয়াত তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যে যুদ্ধে শরিয়ত দৃষ্টে অপরাগ (বৃদ্ধ ও মহিলা) ব্যতীত সমস্ত সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিল শুধু তিন ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা কোন প্রকারের অপরাগতা প্রদর্শন করা ছাড়াই স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। যা ছিল অপরাধ। যুদ্ধে

অংশ না করা। সাহাবীদের প্রভু মহান আল্লাহ পরক্ষণে তাদের তাওবা কবুল করেন ও তাদেরকে ক্ষমা করেন।

সাহাবীগণের আদালত সম্পর্কে হাদীস থেকে প্রমাণ

১ম হাদীস

عن أبى سعيد رضي الله عنه قال كان بين خالد بن وليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم شيئ فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبو أحدا من أصحابى فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم

অর্থাৎ– আবু ছাইদ রা. বলেন সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর মাঝে একটু মনোমালিন্য ঘটে তাই খালিদ রা. আব্দুর রহমান বিন আউফ রা.-কে গাল মন্দ বলেন। এতদ শ্রবণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তোমরা কেউ আমার কোন সাহাবীকে মন্দ বলবে না। কেননা তোমরা যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান কর তাও তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র দানের সমকক্ষ হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রা. 'আসসারেমুল মাসলুল' কিতাবে লিখেন, যে ব্যক্তির এক বৎসর এক মাস বা একদিন অথবা কিছুক্ষণ সময় ঈমানের সাথে রাসূলের সংস্রব লাভ করার সুযোগ হয়েছে, সেও রাসূলের সাহাবী। সে রাসূলের সহচরের পূর্ণ মর্যাদা পাবে। এধরণেরই অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও অন্যান্যরাও। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে খালিদ বিন ওয়ালিদ নিজেই একজন বিশিষ্ট সাহাবী। এমতাবস্থায় তাঁকে লক্ষ্য করে কেমন করে রাসূল বললেন তোমরা আমার কোন সাহাবীকে মন্দ বলো না, কেননা তাদের মর্যাদা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি তোমরা যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ও আল্লাহর রাস্তায় দান কর তাও তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম দানের সমকক্ষ হবে না। তাহলে কি খালিদ সাহাবী নয়? উত্তর এই যে, আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং তার সমকক্ষগণ তখনও রাসূলের সাহাবী যখন খালিদ বিন ওয়ালিদও তার সমকক্ষগণ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ সে সব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছেন ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছেন। নিশ্চয় এসব সাহাবীদের মর্যাদা ঐ সব সাহাবীদের থেকে অনেক বেশি যারা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন ও তার রাস্তায় জেহাদ করেছেন ও সম্পদ ব্যয় করেছেন, যদিও উভয় শ্রেণির জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আব্দুর রহমান ও তার সমকক্ষগণ রাসূলের এমন এক সংস্রবের অধিকারী যা হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী খালিদ রা. ও তার পরবর্তীদের ভাগ্যে জুটেনি। তাই রাসূল তার সে সব সাহাবীদেরকে গালি দিতে নিষেধ করলেন যারা তখনও রাসূলের সাহাবী যখন খালিদ ও তার সমকক্ষগণ সাহাবীও হননি।

২য় হাদীস :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وما يدريك لعل الله إطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما شئتم فقد عفرت لكم. (صحيح البخاري، فتح الباري : ٣٩٨٣ و صحيح مسلم : ٢٤٩٤)

অর্থাৎ– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী ওমর রা. কে লক্ষ্য করে বলেন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? মহান আল্লাহ তাআলা তাদের সব বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞাত হয়েই বলেছেন .إعملوا ما شئتم قد غفر لكم অর্থাৎ- তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

হাদীসের ব্যাখ্যায় বিজ্ঞ আলেমগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। কতিপয় আলেম বলেছেন এখানে উদ্দেশ্য হল, বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আর তা এভাবে যে, তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন করবে না। আর কতক আলেম বলেছেন, হাদীসের অর্থ হল মানুষ হিসাবে তাদের যেসব অপরাধ হয়ে গেছে সবই ক্ষমা করে দেয়া হবে। তাই তাদের

অবস্থা এমন যে মনে হয় তাদের কোন অপরাধই হয়নি। (ইবনে হাজর আসকালানীর মারেফাতু খেছালিল মুকাফফারাহ, পৃ- ৩১)

আল্লামা নববী র. বলেন, বিশিষ্ট আলেমদের মতে পরকালের ক্ষমাই এখানে উদ্দেশ্য। অন্যথায় দুনিয়াতে যদি শাস্তি যোগ্য কোন অপরাধ করেই ফেলে তাহলে তাদের উপরও শাস্তি প্রয়োগ হবে। কাজী ইয়াজ র. এ মর্মে উম্মতের ঐক্য প্রমাণ করেছেন যে যদি ক্ষমা ঘোষিত কোন বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবী শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেন তাহলে অবশ্যই তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। তার উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর রা. বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কতিপয় সাহাবীর ওপর শাস্তি প্রয়োগ করেছেন। কুদামা বিন মাজউন বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্তাহ রা. এর ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করেছেন অথচ তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম র. বলেন হাদীসে বর্ণিত সম্বোধন এমন এক শ্রেণির লোকের জন্য হয়েছিল যাদের ব্যাপারে আল্লাহ নিশ্চিত জানতেন যে এরা ধর্ম ত্যাগী হবে না। বরং ইসলামের ওপর মৃত্যু বরণ করবে। তবে অন্যদের থেকে যেমন অন্য অপরাধ প্রকাশ পায় তাদের থেকেও তা প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সে অপরাধের ওপর স্থির রাখেন না বরং তা ত্যাগ করে তওবার সৌভাগ্য দান করেন, যা দ্বারা তাদের মন্দের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দেয়। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদের ক্ষমার ঘোষণাও তাদের ফরজ বা নফল কোন নেক আমলের অপ্রয়োজনীয়তা সাক্ষী নয়। কেননা যদি ঐ রূপেই হত তাহলে তাদের নামাজ রোযা হজ যাকাত ইত্যাদি কিছুরই দরকার হত না। আর এটা একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব।

৩য় হাদীস :

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا (متفق عليه)

বিশিষ্ট সাহাবী ইমরান বিন হোসাইন রা. বর্ণনা করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার যুগের মানুষই সর্ব উত্তম মানুষ। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ। অত:পর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ।'

ইমরান বিন হোসাইন বলেন, আমার একথা ঠিক জানা নাই যে, রাসূলের যুগের পর দুই যুগের কথা উল্লেখ করেছেন না তিন যুগের কথা।

৪র্থ হাদীস

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألنجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون وإنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتي أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمن ما يوعدون. (روا مسلم)

সাহাবী আবু মুসা আল আশআরী বর্ণনা করেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নক্ষত্রসমূহ আসামনের নিরাপত্তা। নক্ষত্রের বিলুপ্তি ঘটলে আসমানের অধিবাসীর কাছে প্রতিশ্রুত বিপদ চলে আসবে। আর আমি আমার সাহাবীদের নিরাপত্তা। যখন আমি চলে যাবো তখন আমার সাহাবীগণের কাছে প্রতিশ্রুত বিপদ এসে যাবে। আমার সাহবীগন আমার উম্মতের নিরাপত্তা। যখন আমার সাহাবীগণ চলে যাবেন তখন উম্মতের কাছে প্রতিশ্রুত বিপদ আসবে।" (মুসলিম ২৫৩১)

৫ম হাদীস

عن عمر بن خطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم وفي رواية أخرى إحفظوني في أصحابي. رواه بن ماجة٢/ ٦٤

সাহাবী ওমর রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার সাহাবীদেরকে তোমরা সম্মান কর। কেননা, তারা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ।" অন্য বর্ণনায় আছে

"আমার সম্মানার্থে তোমরা সাহাবীদেরকে সম্মান কর।" ইবনে মাজা ২/৬৪ আহমদ ১/১৮ হাকেম ১/১১৪।

৬ষ্ঠ হাদীস

عن واثلة يرفعه: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى وصحبني والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رأني وصحبني. والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحبني. رواه بن أبي شيبة : ١٧٨

ওয়াছেলা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহর কসম! যত দিন তোমাদের মাঝে আমার সাহাবীগণ বিদ্যমান থাকবে ততদিন তোমাদের মাঝে কল্যাণ বিরাজ করবে। আল্লাহর কসম! আমার সাহাবীদেরকে যারা দেখেছেন তারা যতদিন বিদ্যমান থাকবে ততদিন তোমাদের মাঝে কল্যাণ বিরাজ করবে। (আবু শাইবা ১২/১৭৮)

৭ম হাদীস

عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أية الإيمان حب الأنصار وأية النفاق بغض الأنصار وقال في الأنصار كذالك: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. البخاري ٧/ ١١٣، مسلم١ / ٨٥

সাহাবী আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আনসারদের ভালোবাসা ঈমানের অংশ আর তাদের সাথে শত্রুতা মুনাফেকির লক্ষণ।" আনসারদের প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্রে বলেন, "আনসারদেরকে কেবল মু'মিনগণই ভালোবাসে আর কেবল মুনাফেকগণই তাদের সাথে শত্রুতা রাখে।" (বুখারী ১১৩/৭ মুসলিম ৮৫/১)

সাহাবীদের মর্যাদার ওপর বিস্তারিত আলোচনা বিশাল বিস্তীর্ণ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. তার ফাযায়েলুস সাহাবা নামক গ্রন্থে প্রায় দু'হাজার হাদীস ও আছারে সাহাবী (সাহাবীদের বাণী) উল্লেখ করেছেন যা এ বিষয়ে সবচে বৃহৎ সংকলন।

উল্লেখিত বর্ণনার সারসংক্ষেপ

আলোচিত অধ্যায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে সাহাবীদের যে মহৎ গুণাবলি প্রমাণিত হয় তা এই—১ম : মহান আল্লাহ তাদের দৃশ্যমান আর অদৃশ্যমান সব বিষয়ে পরিশুদ্ধতা ও নিষ্কলুষতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। দৃশ্যমান বিষয়ে পরিশুদ্ধতা যেমন মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত করেছেন। তাই তাদের সম্পর্কে বলেছেন–

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. سورة الفتح ﴿٢٩﴾

অর্থাৎ- "তারা কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর আর নিজেরা পরস্পর সহানুভূতিশীল।" (সূরা আল-ফাতাহ : ২৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . سورة الحشر ﴿٨﴾

অর্থাৎ– "তারা আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলকে সাহায্য করে এবং তারা সত্যবাদী।" (সূরা আল-হাশর : ৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন–

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ . سورة الحشر : ﴿٩﴾

অর্থাৎ– "মুহাজেরদিগকে যা দেয়া হয়েছে তজ্জন্যে আনসারগণ ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।" (সূরা আল-হাশর : ৯)

আর তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলো এমন এক গোপনীয় বিষয় যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না। তাই মহান আল্লাহ নিজেই তাদের অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদিগকে জানাচ্ছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন—

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

অর্থাৎ– "আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি শান্তি নাযিল করলেন।" (সূরা আল ফাতাহ : ১৮)

মহান আল্লাহ আরও বলেন–

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

অর্থাৎ– "আনসারগণ তাদের নিকট হিজরত কৃত মু'মিনদেরকে ভালোবাসে।" (সূরা আল-হাশর : ৯)

মহান আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেন–

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. سورة الفتح ﴿٢٩﴾

"তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।" (সূরা আল-ফাতহ : ২৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন–

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ . سورة التوبة : ﴿١١٧﴾

অর্থাৎ– "আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিলেন।" (সূরা আত-তাওবাহ: ১১৭)

তাদের অভ্যন্তরের নিয়ত বিশুদ্ধতার কারণে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়েছেন ও তাদেরকে ক্ষমা করেছেন আর এটা সকলেরই জানা কথা যে তাওবা ও নিয়ত অন্তরের অদৃশ্য কাজ।

২য় :- মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তারা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাই মহান আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এবং তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৩য় :- তাদের উল্লেখিত গুণাবলীর কারণে আমাদেরকে তাদের জন্য দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। বরং স্বয়ং রাসূলের প্রতি নির্দেশ হয়েছে তাদেরকে সম্মান করতে ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে ও তাদেরকে ভালোবাসতে, আর নিষেধ করেছেন আমাদেরকে তাদেরকে মন্দ বলতে ও গালি দিতে। যেমনিভাবে নিষেধ করেছেন তাদের সাথে শত্রুতা রাখতে। বরং বলা হয়েছে তাদেরকে ভালোবাসতে। তাদের সাথে ভালোবাসা ঈমানে লক্ষণ আর তাদের সাথে শত্রুতা করা মুনাফেকির লক্ষণ।

৪র্থ :- সাহাবীগণ হলেন এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও উম্মতের অতন্দ্র প্রহরী এজন্যই পুরা মুসলিম জাতির উপর তাদের অনুসরণ করা ওয়াজিব, বরং এটিই জান্নাতে যাওয়ার একমাত্র পথ। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى. رواه أحمد : ٤/ ١٦٢

অর্থাৎ- "তোমরা আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর আর আমার পর সঠিক পথের অনুসারী খলীফা তথা আমার প্রতিনিধিদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর।" (আহমাদ ১৬২/৪)

সাহাবীদের মর্যাদা সকল বস্তু বা ব্যক্তির উর্ধ্বে :

সাহাবী তথা যে ঈমানের সাথে রাসূলের সংস্রব অবলম্বন করেছে - যদিও তা অল্প ক্ষণের জন্য হোক- তার মর্যাদা সকল মানুষের নিকট স্বীকৃত, এমনকি একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও অন্য

একজন অসাধারণ সাহাবীর নিকট স্বীকৃত। একথার প্রমাণ হিসাবে হাফেজ ইবনে হাজার র. বলেন আমি মুহাম্মদ বিন কুদামা আল-মারওয়াজী লিখিত আখবারুল খাওয়ারেজ (খারেজীদের সম্পর্কে) কিতাবে পড়েছি, সেখানে লেখা ছিল নুবাইজ আল-আনাজি আবু সায়ীদ আল- খুদরীর ঘটনা বর্ণনা করেন যে আমরা তাঁর নিকট বসে ছিলাম আর তিনি তখন হেলান দিয়ে আমাদের সাথে আলাপ করছিলেন। এ সময় আলী রা. ও মুআবিয়ার রা. এর আলোচনা উঠে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি মুআবিয়া রা. সম্পর্কে কুটুক্তি করে বসল। এতদাশ্রবণে সাহাবী আবু সায়ীদ আল- খুদরী সোজা হয়ে বসলেন এবং সাহাবীদের মর্যাদার প্রসঙ্গে নিজের একটি ঘটনা বললেন। ঘটনাটি হল আবু বকর, ওমর, একজন বেদুঈনসহ কয়েকজন সাহাবী রাসূলের নিকট বসা ছিলেন। অতঃপর দেখি সে বেদুঈন একদিন সাহাবী ওমর রা. এর নিকট এসে আনসারদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করেছে। এটা শুনে ওমর রা. বললেন যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এ বেদুঈনের সংস্রব না থাকত তাহলে এক্ষণে তার শির উচ্ছেদ করে ফেলতাম। এখানে ওমর রা. ঐ বেদুঈনকে শাস্তি দেওয়া তো দূরে থাক ভর্ৎসনা পর্যন্ত করলেন না। কারণ এ বেদুঈন রাসূলের সংস্রব পেয়েছে। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলের সহচর্য সকল সম্মানের উর্ধ্বে।

আল্লামা ওয়াকী র. বলেন আমি বিখ্যাত সাধক সুফিয়ান রা. কে মহান আল্লাহ তাআলার বাণীর—

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

অর্থাৎ- 'বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য আর শান্তি ও নিরাপত্তা নির্বাচিত বান্দাদের জন্য'— ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি যে এখানে নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা সাহাবীগণকে বুঝান হয়েছে। আল্লাহর এ মনোনয়ন যে কত গুরুত্ববহ তা ধারণার উর্ধ্বে, তাই সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি এলেম ও আমলে যতই অগ্রসর হোক না কেন, কোন সাহাবী থেকে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা তাদের বা তাদের নিকটবর্তীও হতে পারবে না। ইবনে ওমর রা. বলেন–

لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة و رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره . رواه أحمد فى فضائل الصحابة : ١/ ٥٨ إبن ماجة : ١/ ٣١، بن أبى عاصم : ٢/ ٤٨٤

"তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথিদেরকে মন্দ বলো না। কেননা রণক্ষেত্রে তাদের এক মুহূর্তের অবস্থান তোমাদের চল্লিশ বৎসর ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।" অন্য বর্ণনায় আছে, "তোমাদের সারা জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম।" বিরাট সংখ্যক আলেমগণের মতে যেহেতু সাহাবীগণের রাসূলের সহচর্যের সুযোগ হয়েছে তাই অন্য লোকের কোন আমলই তার সমকক্ষ হতে পারে না।

আর যে সব সাহাবী রাসূলের সংস্রব লাভের সাথে সাথে রাসূলের প্রতিরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন, সাহায্য ও হিজরতে অগ্রগামী ছিলেন অথবা রাসূল আনীত শরিয়তকে পরবর্তীদের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেছেন, অন্য কোন মানুষই সে সব সাহাবীর মর্যাদায় আরোহণ করতে পারে না।

কেননা তাঁরা যে সব নেক আমল করেছেন, ভবিষ্যতে যারাই সে সব নেক আমল করবে তাদের সমপরিমাণ পুণ্য প্রথম ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই পাবেন, তাতে সহজেই বুঝা যাচ্ছে অন্য কেউ তাদের সমকক্ষ হতেই পারে না। (ফতহুল বারী ৭/৭)

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন–

فأدناهم صحته هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال . شرح أصول إعتقاد أهل السنة للألكائي / ١٦٠

অর্থাৎ "রাসূলের স্বল্পতম সংস্রব প্রাপ্ত ব্যক্তি পশ্চাতে আগত যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষায় উত্তম, যদিও তার মাঝে সব ধরনের নেক আমলের সমাবেশ ঘটে।"

আল্লামা নববী (র.) বলেন। রাসূলের সংস্রব যদিও তা এক মুহূর্তের জন্য হয় তার সমকক্ষ অন্য কোনে আমলই হতে পারে না। এবং এ সংস্রব মর্যাদা অন্য কিছু দ্বারা অর্জন হয় না আর ফযীলত বা মর্যাদা কখনও অনুমানের ভিত্তিতে হয় না বরং তা শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। আর এটা মহান আল্লাহ তাআলার অনুদান, যাকে ইচ্ছা দান করেন। মুসলিম শরহে নববী : ১৬/৯৩

এখানে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, মহান আল্লাহ তাআলা যিনি অন্তর্যামী, স্বয়ং তিনি নিজেই তাদেরকে পরিশুদ্ধি করছেন, এর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা আর কি হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

فعلم ما في قلوبهم

"তাদের অন্তরের অবস্থা মহান আল্লাহ তাআলা জানেন।"

মহান আল্লাহ আরও বলেন—

لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار.

"আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি।"

মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. سورة الفتح ﴿١٨﴾

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার নিকট শপথ করল।" আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিশুদ্ধতার এ সনদ সাহাবীদের জন্যই সীমিত, অন্য কারো জন্য নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এমন কিছু হাদীস দেখা যায় যেগুলি দ্বারা বর্ণিত দাবীর বিপরীত বুঝা যায়। যেমন সাহাবী আবু ছালাবার হাদীস, যাতে রাসূল বলেন–

تأتي أيام للعامل فيهن أجر خمسين قيل : منهم أو منا يا رسول الله؟ قال بل منكم. رواه أبوداؤد: ٤٣٤١ والترمذي: ٢/ ١٧٧ وابن ماجة : ٤٠١٤

অর্থাৎ- "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন আমলকারীকে পঞ্চাশ ব্যক্তির সম পরিমাণ পুণ্য দেয়া হবে।" প্রশ্ন করা হল হে রাসূল! তাদের মধ্য হতে পঞ্চাশ ব্যক্তির সমান পুণ্য না আমাদের থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তির সমপুণ্য? রাসূল উত্তর দিলেন "তোমাদের থেকে পঞ্চাশ ব্যক্তির সমমানের পুণ্য তাদের দেয়া হবে।" এমনিভাবে আবু জুমায়াহ রা. বলেন আবু ওবাদা রা. রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল আমরা আপনার উপস্থিতিতে আপনার ঈমান এনেছি এবং আপনার সাথি হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছি তথাপিও কি আমাদের চেয়ে কোন উত্তম মানুষ হতে পার? উত্তরে রাসূল বললেন–

قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. رواه أحمد ٤/١٠٦ والدارمي والطبراني ٤/ ٢٢،٢٣

"হ্যাঁ এমন এক সম্প্রদায় যারা তোমাদের পরে আসবে এবং আমাকে না দেখেও আমার প্রতি ঈমান আনবে। বিপরীতমুখী এ দু প্রকারের হাদীসের সমাধানে আলেমগণ বলেছেন–এ দু'প্রকারের হাদীসগুলোকে বিভিন্নভাবে সম্পূরক অর্থে গ্রহণ করা যায়।

(ক) পরবর্তীদের আমলের পুণ্য পঞ্চাশ গুণ হওয়া পূর্ববর্তীদের চেয়ে উত্তমের প্রমাণ নয়। কেননা কোন ব্যক্তির আমলের বিনিময় অন্য ব্যক্তির আমলের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশি হওয়া সমষ্টিগত ভাবে অন্য ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হওয়ার প্রমাণ নয়।

(খ) অনেক সময় সাধারণ মানুষের মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা অসাধারণ ব্যক্তির মাঝেও পাওয়া যায় না। তাই বলে সে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সঠিক বিবেচনায় সর্বোত্তম ব্যক্তি বলা যায় না।

(গ) পূর্ববর্তী আর পরবর্তীদের সম্মিলিত আমলের ক্ষেত্রে উত্তম অনুত্তমের প্রশ্ন হতে পারে। আর তাহল সর্ব প্রকারের ইবাদত যাতে সমস্ত মু'মিন অংশীদার। এ অসম্ভব কিছু নয় যে কতিপয়

পরবর্তীদের আমল কতিপয় পূর্ববর্তীদের আমলের তুলনায় পঞ্চাশ গুণ বেশি নেকী রাখবে। তবে যেসব মর্যাদা শুধু সাহাবীদের জন্য নির্দিষ্ট, যেমন রাসূলের যুগে উপস্থিতি ও স্বচক্ষে রাসূলের দর্শন লাভ ইত্যাদি। এগুলো এমনি এক সৌভাগ্যের বিষয় যা পরবর্তীদের কারো লাভ করা সম্ভব নয়, পরবর্তীদের কেউ যদি দুনিয়ার সমস্ত নেক আমল করে তাও পূর্ববর্তীদের মর্যাদায় পৌঁছা তো দূরের কথা তাদের কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

(ঙ) আবু জুমা বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাভংগি সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনাকারী خير (উত্তম) শব্দ উল্লেখ করেছেন আর কতিপয় বর্ণনাকারী أعظم (শ্রেষ্ঠ) শব্দ উল্লেখ করেছেন। যেমন তার বাণীর বর্ণনা এসেছে-

قلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا۔ رواه الطبراني. ٤/ ٢٢-٢٣

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হে রাসূল! এমন কোন দল আছে কি? যারা পুণ্যের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে বড়?

হাফেজ ইবনে হাজর (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেন এ হাদীসটি আবু জুমার হাদীসের তুলনায় শক্তিশালী। যেহেতু এটি আবু ছালাবার হাদীস সাদৃশ্য, যার প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

পরিশেষে একটি কথা না জানলেই নয়, তাহল অধিকাংশ আলেমের সাথে কতিপয় আলেমের যে মত পার্থক্য রয়েছে তাহল শুধু সে সকল সাহাবীদের ব্যাপারে যাদের মধ্যে রাসূলের সাহচর্য ব্যতীত অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই। আর যে সব সাহাবীর রাসূলের সাহচর্যের সাথে সাথে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও রয়েছে তাঁরা পরবর্তী যে কোন লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। যেমন চার খলীফা, ও জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত অন্যান্য সাহাবী এবং বদর, তাবুক ও বাইআতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীবৃন্দ। এ জন্যই ইমাম ইবনে আব্দুল বার বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ও হুদাইবিয়ার শপথে অংশ নেয়া সাহাবীদেরকে মতানৈক্যের ঊর্ধ্বে বলে অভিহিত করেছেন।

সাহাবীদেরকে গালি দেয়া প্রসঙ্গে

সাহাবীদেরকে গালি দেয়া বিভিন্ন প্রকারে হতে পারে। প্রত্যেক প্রকারের গালির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। গালি বলতে সাধারণত এ ধরনের বাক্যকে বুঝায় যা দ্বারা প্রতিপক্ষকে অপমান, অসম্মান করা হয় এবং এ অপমান, অসম্মান ধর্ম বর্ণ ও ভাষার ভিন্নতা সত্যেও প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝতে পারে। যেমন কাউকে অভিশপ্ত করা বা কাউকে তিরস্কার করা ইত্যাদি।

সাহাবীদেরকে গালি দেয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তর অন্যটির চেয়ে নিকৃষ্ট। ধর্ম কেন্দ্রিক গালি, যেমন কোন সাহাবীকে কাফের বা ফাছেক বলা। দুনিয়া কেন্দ্রিক গালি, যেমন কোন সাহাবীকে কৃপণ, বে-আকল তথা বোকা বলা। আবার এ গালি হয়ত সব সাহাবীদেরকে হবে অথবা অধিকাংশ সাহাবীদেরকে হবে। অর্থ অনির্দিষ্ট কিছু সাহাবীদেরকে হবে অথবা নির্দিষ্ট কোন সাহাবীদেরকে হবে। আবার সে সাহাবী হয়ত এমন হবে যার মর্যাদা বর্ণনায় অসংখ্য প্রমাণাদি এসেছে। অথবা এমন হবে না। নিম্নে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল।

প্রথমত : যে ব্যক্তি সব সাহাবী অথবা অধিকাংশ সাহাবীকে ধর্মত্যাগী কাফের, ফাছেক বলে গালি দেয় ঃ

যে সমস্ত লোক সাহাবীদেরকে এ ধরনের গালি দেয় তারা নিঃসন্দেহে কাফের। এর প্রধান প্রধান কারণ নিম্নে বর্ণিত হল।

১। এ ধরনের গালমন্দের সারমর্ম হল কুরআন, হাদীসের বাহকগণকে কাফের, ফাসেক ধর্মত্যাগী বলা আর তাদের ব্যাপারে এ ধরনের মন্তব্যের অর্থ হল কুরআন হাদীসে সন্দিহান হওয়া। কেননা বাহকের ব্যাপারে সন্দেহের অর্থ তাদের বহনকৃত বস্তুর মাঝে সন্দেহ করা। আর যারা কুরআন হাদীসে সন্দিহান হবে নিঃসন্দেহে তারা কাফের।

২। সাহাবীদেরকে এ ধরনের গাল মন্দ বলা কুরআন অস্বীকারের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কুরআনে তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাদের প্রশংসা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা যা প্রমাণিত তার অস্বীকারকারী কাফের।

৩। সাহাবীগণ হলেন রাসূলের খুব আপন লোক। প্রিয়জন, বন্ধু ; তাদেরকে গাল মন্দের অর্থ হল রাসূলকে কষ্ট দেয়া আর যে রাসূলকে কষ্ট দেবে সে কাফের।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রহ. এ প্রকারের লোকদের হুকুম বর্ণনায় বলেন। যারা সাহাবীদের অপমানে সীমা অতিক্রম করে এবং বলে যে, রাসূলের তিরোধানের পর তারা সবাই ধর্ম ত্যাগী হয়ে গেছে মাত্র কয়েকজন ব্যতীত। যাদের সংখ্যা দশের ঊর্ধ্বে নয়। অথবা যারা অধিকাংশ সাহাবীদেরকে ফাসেক বলে। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নেই। কেননা কুরআনের বহু স্থানে সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর যে সন্তুষ্টি ও তাদের যে প্রশংসা করা হয়েছে তারা তার অস্বীকারকারী। আর যারা কুরআন অস্বীকারকারী তারা নিশ্চয় কাফের। বরং যারা এই ধরনের লোকদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দিহান হবে তারাও নিশ্চিত কাফের। পরিশেষে তিনি বলেন এ সব লোক কাফের হওয়া দীনে ইসলামে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। (আস-সারেমুল মাসলুল : ৫৮৬-৮৭)

আল্লামা হাইছামি রহ. বলেন যে সব লোক কিছু সংখ্যক সাহাবীদেরকে গালমন্দ বলে তারা কাফের কি না? এতে মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু যারা সব সাহাবীদেরকে গালি দেয়, মন্দ বলে সে সব লোক কাফের হওয়ার ব্যাপারে কারও কোন দ্বিমত নেই। পূর্বে উল্লিখিত পর্যাপ্ত প্রমাণাদির পরও সাহাবীদেরকে গালি দেয়া কুফরী হওয়া সম্পর্কে আলেমগণ আরও বিস্তারিত প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন।

১। পূর্বে উল্লিখিত সুরা আল ফাতহ এর সর্ব শেষ আয়াতের তাফসীর আলোকে ইমাম মালেক রহ. বলেছেন যে, যারা সাহাবীদিগকে আড় চোখে দেখে তারা কাফের। কেননা সাহাবীগণ তাদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। আর সাহাবীগণ যাদের অন্তর্জালার কারণ হয় তারা কাফের। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এ মন্তব্য করেছেন।

২। পূর্বে উল্লিখিত সাহাবী আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আনসারদের ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন। অন্য বর্ণনায় আছে আনসারগণকে শুধু মু'মিনগণই ভালোবাসে আর শুধু মুনাফেকগণই তাদের সাথে শত্রুতা রাখে। আবু হুরাইরা রা. সূত্রে মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে কখনও আনসারদের সাথে শত্রুতা রাখে না। (মুসলিম ১/৮৬)

অর্থাৎ আনসারদেরকে গালি দেয়া তো দূরের কথা মু'মিনগণ কখনও তাদের সাথে কোন প্রকার বিদ্বেষও রাখে না। সুতরাং যারা তাদেরকে গাল মন্দ বলে তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান হীন মুনাফেক। বর্ণিত আছে যে, খলীফা ওমর রা. কে জনৈক ব্যক্তি আবু বকর রা. এর পর প্রাধান্য দেয়ার অপরাধে বেত্রাঘাত করে বললেন, বহুবিদ কারণে রাসূলের পর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হলেন আবু বকর, যে এর ব্যতিক্রম বলবে আমি তার উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করব। (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রচিত ফাযায়েলুস সাহাবা (১/৩০০)

এমনিভাবে আমিরুল মু'মিনীন আলী রা. বলেছেন তোমরা কেউ আমাকে আবু বকর রা. ও ওমর রা. এর উপর প্রাধান্য দিবে না। অন্যথায় তার উপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করব।

فضائل الصحابة ١/ ٨٣ والسنة لابن أبى عاصم ٢/ ٥٨٥ عن طريق الحاكم بن حجل وسنده ضعيف لضعف أبى عبيدة ابن الحكم انظر فضائل الصحابة ١/ ٨٣ لكن له شواهد أحدها عن طريق علقمة عن على عند ابن أبى عاصم فى السنة ٢/ ٤٨ حسن لألبانى اسناده والأخر عن سويد ابن غفلة عن على عند الألكائي. ٧/ ١٢٩٥

সত্য নিষ্ঠ খলীফাগণের নিকট ওমর রা.-কে আবু বকর রা. এ উপর আর আলী রা.-কে ওমর ও আবু বকরের উপর প্রাধান্য দেয়া যদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়ে থাকে যা কোন রকম গাল মন্দ ও দোষারোপের মধ্যে পড়ে না, তাহলে সাহাবীদিগকে গালি দেয়া তাদের নিকট কত বড় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। (আছছারেম আল- মসলুল ৬৮৬)

দ্বিতীয়ত : যে ব্যক্তি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে দীনী ব্যাপারে অপবাদ মূলক গালি দেয় ঃ

যদি এমন কোন সাহাবীর উপর কুফরী বা ফাসেকির অপবাদ আরোপ করে যার মর্যাদার ব্যাপারে শরীয়তের ধারাবাহিক প্রমাণাদি রয়েছে[১] যেমন চার খলীফা ইত্যাদি। বিশুদ্ধ মত অনুসারে এ ধরনের অপবাদ দানকারী কাফের। কেননা সে ধারাবাহিক প্রমাণের অস্বীকারকারী।

মুহাম্মদ বিন আবি সাঈদ সাহনুন রহ. থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আবু বকর রা. ওমর রা. উসমান রা. ও আলী রা. সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করে যে, তারা পথ ভ্রষ্ট, কাফের ছিলেন তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। আর তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীকে এ ধরনের কটাক্ষ করে তাহলে তাকে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেয়া হবে। (কাজী ইয়াজ লিখিত আশ-শিফা : ২/১১০৯) হিশাম বিন আম্মার বলেন: আমি ইমাম মালেক রহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আবু বকর রা. এবং ওমর রা.-কে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে এবং যে আয়েশা রা.-কে গালি দেবে তাকেও হত্যা করা হবে। কেননা মহান আল্লাহ আয়েশা রা. প্রসঙ্গে বলেন–

يَعِظُكُمَ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . سورة النور ﴿١٧﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।" (সূরা আন-নূর : ১৭)

সুতরাং যে আয়েশা রা. কে অপবাদ দিল সে কুরআনের বিরোধিতা করল আর যে কুরআনের বিরোধিতা করবে তাকে হত্যাই করতে হবে। (আছ ছাওয়ায়েকুল মুহরিকা : ৩৮৪)

অন্য বর্ণনায় ইমাম মালেক রহ. বলেন যে আবু বকর রা. কে মন্দ বলবে তাকে কোড়া মারা হবে, আর যে আয়েশা রা. কে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হল এ রূপ কেন? উত্তরে তিনি বললেন আয়েশাকে রা.-কে অপবাদকারী কুরআন বিরোধী তাই তাকে হত্যা করা হবে। তবে একথা সুস্পষ্ট যে এখানে আবু বকরকে গালি দেয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাঁকে কাফের ফাসেকের মত জঘন্যতম গালি নয়, অন্যথায় সেও কাফের, আর তা বুঝা যাচ্ছে আয়েশা রা. উপর অপবাদ আরোপ কারীর বিষয়ে মন্তব্য থেকে, অর্থাৎ সে কুরআন বিরোধী। তাই আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে ব্যক্তি আবু বকরকে কাফের ফাসেক বলে জঘন্যতম গালি দেবে সে কাফের। কেননা সে ও কুরআন অস্বীকার কারী। কারণ আবু বকর (রা.) রাসূলের সাহাবী হওয়া কুরআন দ্বারা স্বীকৃত। তাই বুঝতে হবে ইমাম মালেক রহ. যে বলেছেন, যে ব্যক্তি আবু বকর রা. কে গালি দেবে তাকে কোড়া মারা হবে। তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে সাধারণ গালি দেয়, কাফের ফাসেক বলে জঘন্যতম গালি নয়। কেননা ইমাম মালেক রহ. থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে যদি কোন ব্যক্তি আবু বকর (রা.) থেকে কম মর্যাদার অধিকারী কোন সাহাবীকেও কাফের ফাসেক বলে গালি দেয় তাকেও হত্যা করা হবে। (আশ-শিফা : ২/১২০৯)

আল্লামা হাইছমী রহ. আবুবকর রা. কে গালির বর্ণিত হুকুমের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন : সংক্ষিপ্ত কথা হল হানাফী মাজহাব মতে আবু বকরকে গালি দেয়া কুফরী, শাফেয়ী মাজহাবের এক বর্ণনাও তাই। মালেকী মাজহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে কুফরী নয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোড়া মারা ওয়াজিব।

হ্যাঁ ইমাম মালেক রহ. এর এক অভিমত এও আছে যে, আবু বকর রা. কে গালি দেয়া কুফরী, যেমন খারেজি সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

---

[১] بعض العلماء يقيد ذالك بالخلفاء والبعض بقتصر على الشيخين وم العلماء من يفرق بأعتبار تواتر النصوص بفضله أو عدم تواترها ولعله لأقرب والله أعلم وكذالك البعض ممكن بكفر ساب الخلفاء يقصر ذالك على ريتهم بالكفر ولأخرون يعممون بكل سب فيه طعن فى الدين.

সারকথা হল, ইমাম মালেকের নিকট আবু বকর রা. কে গালি দেয়ার দু অবস্থা, হয় আবু বকর রা. কে কাফের বলবে, না হয় যদি কাফের বলে তাহলে গালি দাতা কাফের, অন্যথায় নয়। (আছছাওয়ায়েকুল মুহরিকাহ : ৩৮৬)

আল্লামা হাইছমি রহ. আরও বলেন- আবু বকর এবং তাঁর অনুরূপ জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীগণকে কাফের বলার ব্যাপারে শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারীগণ কোন মন্তব্য করেনি। তবে আমার দৃষ্টিতে তারা নিশ্চিত কাফের। (আছছাওয়ায়েহুল মুহরিকাহ : ৩৮৫)

আল্লামা খারাশি (রহ.) বলেন যে বিষয়ে আয়েশা রা. কে মহান আল্লাহ নিষ্পাপ বলেছেন সে বিষয়ে তাকে পুনরায় অপবাদ দেয়া বা আবু বকর রা. এর রাসূলের সাহচর্য অস্বীকার করা, অথবা জান্নাতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত কোন সাহাবীর ইসলামকে অস্বীকার করা অথবা সব সাহাবীর ইসলাম অস্বীকার করা, অথবা চার খলীফাকে অথবা তাদের কাউকে কাফের বলা সম্পূর্ণ কুফরী। আল্লামা বাগদাদী রহ. বলেন বিজ্ঞ আলেমদের অভিমতে যে দশজন সাহাবীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়েছেন তাদের কাউকে কাফের বলা কুফরী। বিজ্ঞ আলেমগণের আরও নির্দেশ হল রাসূলের সমস্ত স্ত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। তাদেরকে বা তাদের কাউকে কাফের বলা সম্পূর্ণ কুফরী। (আল ফরকু বাইনাল ফেরাকে : ৩৬০) যদিও এ বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য থেকে থাকে তথাপিও অগ্রাধিকার যোগ্য মতানুসারে অপরাধীগণ কাফের।

আর যারা তাদেরকে কাফের বলেন না তারাও একথার উপর একমত যে তারা ফাসেক, কেননা তারা কবিরা গুনায় লিপ্ত। সমালোচিত সাহাবী ও সমালোচনার অবস্থা ভেদে সাজা ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ তা নির্ধারণ করবে। আল্লামা হাইছমী রহ. বলেন, যারা সাহাবীদের গালমন্দকারীদেরকে কাফের বলে না তারাও তাদের ফাসেক হওয়ার ব্যাপারে একমত। (আছছাওয়ায়েকুল মুহরেকাহ : ৩৮৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন ইব্রাহিম নখয়ির অভিমতে আবু বকর রা. এবং ওমর রা. কে গালি দেয়া কবিরা গুনাহ। আবু ইছহাক আস-সুবাইয়ি রহ. ও বলেন আবু বকর এবং ওমর রা. কে গালি দেয়া সে সব কবিরা গুনার অন্তর্ভুক্ত, যে গুলো থেকে বেচে থাকলে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সাহাবীদিগকে গালি দেয়ার অবস্থা যখন এই, তখন তার সর্ব নিম্নবিধান হল শাস্তি প্রয়োগ। এবং এ বিষয়ে সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন এবং পরবর্তী সমস্ত আলেমগণ একমত যে রাসূলের সাহাবীগণ সকলই প্রশংসা এবং দুআ ও দয়া প্রাপ্য। যারা তাদের সাথে অশালীন আচরণ করবে তারা শাস্তির যোগ্য। (আল আলকায়ি : ৭/১২৬২- আছছারেমূল মাসলুল : ৫৭৮)

কাজী আয়াজ রহ. বলেন যে কোন সাহাবীকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহ। আর আমাদের এবং অধিকাংশ আলেমদের মাজহাব মতে তাকে হত্যা নয় শাস্তি দেয়া হবে।

আব্দুল মালেক বলেন, 'শিয়া সম্প্রদায় থেকে যারা সাহাবী উছমান রা. থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে ও তাঁর সাথে শত্রুতা রাখে, তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে। আর যদি আরও অগ্রসর হয়ে সাহাবী আবু বকর রা. ও ওমরের সাথে শত্রুতা রাখে তাহলে তাদের শাস্তি আরও বেড়ে যাবে তাদেরকে পালাক্রমে বেত্রাঘাত করা হবে ও মৃত্যু পর্যন্ত জেল খানায় আবদ্ধ রাখতে হবে।' আশশিফা ২/১১০৮ আছছারেমুল মাসলুল : ৫৬৯)

সুতরাং যে আবু বকর রা. কে গালি দেবে তার শাস্তি শুধু কোড়া মারার উপর সীমাবদ্ধ থাকবে না যা অন্যদের বেলায় হয়ে থাকে, বরং তার শাস্তি কঠিন থেকে কঠিনতর হবে। কারণ কোড়া মারার সাজাতো ঐ ব্যক্তির উপরও প্রয়োগ হবে যে শুধু রাসূলের সাহচর্য প্রাপ্ত কোন সাহাবীর সাথে শিষ্টাচার বিবর্জিত আচরণ করবে। আর যদি এ আচরণ এমন কোন সাহাবীর সাথে করে যার সাহচর্য ব্যতীত আরও অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন ইসলাম ও মুসলমানের সাহায্য, খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব ও রাষ্ট্র বিজয় ইত্যাদি—এ সব বৈশিষ্ট্যের দাবি হল তার সাথে বিশেষ শিষ্টাচার সুলভ আচরণ। যদি কেউ এর ব্যতিক্রম করে তাহলে তাকে অধিকতর কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। (আছছাওয়াকুল মুহরেকাহ : ৩৮৭)

আর এখানে যে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কোন রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন নয়, বরং তা ইসলামী বিধান যা প্রয়োগ করতেই হবে। ইমাম আহমদ রহ. বলেন কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে

কোন সাহাবীর সমালোচনা করবে বা তাদের কোন দোষ ক্রটির জন্য তাদেরকে অপবাদ দেবে। যদি কোন ব্যক্তি এমন করে থাকে তাহলে প্রশাসক এর উপর অপরিহার্য কর্তব্য যে তাকে শাস্তির সম্মুখীন করবে। রাষ্ট্রপতির জন্য বৈধ নয় যে তাকে ক্ষমা করবে। বরং তাকে শাস্তি দিয়ে তাওবা তলব করা হবে। যদি তাওবা করে তাহলে ক্ষমা পাবে অন্যথায় পুনরায় শাস্তি দিয়ে জেলখানায় আবদ্ধ করা হবে। অন্যায় ত্যাগ বা মৃত্যু বরণ পর্যন্ত। (তাবাকাতুল হানাবেলা : ২১/২৪ আছছারেমুল মাসলুল : ৫৬৫)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেন এ ধরনের ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রয়োগ করতেই হবে। যে সব আলেমগণের মতে সাহাবীদেরকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহ সে কবিরা গুনাহ হিসাবে তার উপর হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ যদি একে হালাল মনে করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। অন্যথায় নয়।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ. সাহাবীদেরকে গালি দেয়া বৈধ ধারণাকারীর হুকুম বিশ্লেষণে বলেন, যদি কোন নির্দিষ্ট সাহাবীকে গালি দেয় তাহলে দেখতে হবে সে সাহাবীটি কেমন? যদি এমন কোন নির্দিষ্ট সাহাবীকে গালি দেয় যার মর্যাদা বা সম্মানের ব্যাপারে ধারাবাহিক প্রমাণাদি রয়েছে যেমন চার খলীফা ; তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার দৃষ্টি ভঙ্গি কি? যদি সে সত্যি সত্যি সেই সাহাবীকে গালি দেয় এবং তাকে বৈধ মনে করে তাহলে সে কাফের। কেননা সে রাসূল থেকে নিশ্চিত প্রমাণিত বিষয়কে অস্বীকার করেছে। আর যদি সত্যিকারার্থে গালি না দেয় বা গালি দেয়াকে হালাল মনে না করে তাহলে সে ফাসেক। কেননা মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী।

তবে কতিপয় আলেম আবু বকর এবং ওমর রা. কে যেকোন রকম গালি দেয়াকে কুফরী বলেছেন।[২]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি রাসূলের কোন সাহাবীকে গালি দেয় তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি ? উত্তরে তিনি বললেন, ما أراه على الأسلام 'আমি তাকে মুসলমান মনে করি না।' ইমাম আহমদ রহ. এর এ উক্তির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে কাজি আবু ইয়ালা রহ. বলেন, ইমাম আহমদ রহ. যা বলেছেন তার সাথে অন্যদের কথার সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তিনি যে বলেছেন আমি তাকে মুসলমান মনে করি না, এটা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে গালি দেয়াকে বৈধ মনে করে। আর অন্যরা যা বলেছেন অর্থাৎ হত্যা নয় শাস্তি, তা সে ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে তাদেরকে গালি দেয়া অবৈধ ও হারাম মনে করা সত্ত্বেও গালি দেয়। যেমন অন্যান্য অপরাধকে অপরাধ মনে করা সত্ত্বেও তা করে। অতঃপর ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বক্তব্যের অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করেন।[৩]

নির্দিষ্ট সাহাবীকে গালি দেয়ার বিষয়ে আলোচনার সার সংক্ষেপ এই যে, যদি সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি এমন হয় যে তার মর্যাদার উপর শরীয়তের ধারাবাহিক প্রমাণাদি রয়েছে। আর গালিটা এমন যা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপবাদ তুল্য, তাহলে সে কাফের। কেননা সে শরীয়তের ধারাবাহিক প্রমাণকে অস্বীকার করল। আর যে সব আলেমের মতে তারা কাফের নয় তারাও এ কথার উপর একমত যে তারা কবিরা গুনাহতে লিপ্ত। তাই তারা অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে। যা ক্ষমা করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানও রাখেন না। এবং সমালোচিত সাহাবীর মর্যাদা অনুযায়ী শাস্তি বৃদ্ধি পাবে। তবে তাদের ধারণা মতে তারা কাফের হবে না। হ্যাঁ যদি সাহাবীদের গালির মাঝে এত সীমাতিরিক্ত করে যে, সাহাবীদেরকে গালি দেয়া ইবাদত মনে করে তাহলে সর্ব সম্মতি ক্রমে তারা কাফের। যা আলেমগণের পূর্বের আলোচনায় সুস্পষ্ট। (আসসারেমুল মাসলুল : ৫৭১)

---

[২] الرد على الرافضة ص ١٩

[৩] الصارم السلول ص ٥٧١ وما قبلها

তৃতীয় : এমন সাহাবীকে গালমন্দ করার বিধান যার মর্যাদার উপর শরীয়তের ধারাবাহিক কোন প্রমাণ নেইঃ

আমরা ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, যেসব সাহাবীর মর্যাদার উপর শরীয়তের ধারাবাহিক প্রমাণ রয়েছে তাঁকে ধর্মীয় বিষয়ে অপবাদজনক কোন গালি দেয়া কুফরী। আর যার মর্যাদার উপর ধারাবাহিক প্রমাণাদি নেই তাকে ধর্মীয় বিষয়ে অপবাদজনক মন্দ বলা অধিকাংশ আলেমদের মতে কুফর নয়। যেহেতু সে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন প্রমাণকে অস্বীকার করেনি। হ্যাঁ, সে যদি রাসূলের সাহচর্য কেন্দ্রিক কোন কটাক্ষ করে তাহলে অন্য কথা।

ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যাচ্ছে যে সাহাবীর মর্যাদার বিষয়ে শরীয়তের ধারাবাহিক প্রমাণ নেই তাকে মন্দ বলা ফাসেকী। তবে হ্যাঁ যদি রাসূলের সাহচর্য কেন্দ্রিক কোন মন্দ বলে তাহলে সে কাফের।[৪] (আর রদ্দু আলা আর-রাফেজা- ১৯)

চতুর্থ: কিছু সংখ্যক সাহাবীকে এমন মন্দ বলা যা ধর্মীয় বিষয়ে অপবাদজনক নয়ঃ

নি:সন্দেহে ওসব লোক শাস্তির উপযোগী। তবে আমি যতটুকু কিতাব পত্র অধ্যয়ন করেছি তাতে এ ধরনের মন্দের উপর কাফের বলতে কাউকে দেখিনি। এবং উচ্চ মর্যাদা ও নিম্ন মর্যাদার মাঝে কোন প্রভেদ দেখিনি।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন সাহাবীদিগকে যদি কেউ এমন মন্দ বলে যা তার নিরপেক্ষতা ও ধার্মিকতায় আঘাত হানে না। যেমন কোন সাহাবীর ব্যাপারে মন্তব্য করল যে তিনি কৃপণ বা ভীত ছিলেন বা তার ইলম কম ছিল কিংবা তিনি দুনিয়া ত্যাগী ছিলেন না। এ ধরনের মন্তব্যকারী শাস্তির সম্মুখীন হবে, কিন্তু শুধু এ কারণে তাকে কাফের বলা হবে না। যেসব আলেমগণ সাহাবীদেরকে মন্দ বলা কুফরী মনে করেন না, তাদের মন্তব্যের ব্যাখ্যাও এটাই।[৫] আল্লামা আবু ইয়ালা রহ. বলেন কোন সাহাবীর ব্যাপারে এ মন্তব্য করা যে তিনি রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এটাও সাহাবীদের সে সব মন্দালোচনার অন্তর্ভুক্ত যা তাদের নৈতিকতা ও ধার্মিকতার উপর আঘাত হানে না।[৬] কোন সাহাবীর নির্ভুল লক্ষ্য অর্জনে দুর্বলতা ও ব্যক্তিত্বহীনতা এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও অলসতা ইত্যাদিও বর্ণিত মন্দালোচনার মতই। আর এ প্রকারের সমালোচনা দ্বারা ইতিহাসের কিতাবাবলি প্লাবিত।

এমনিভাবে আহলে সুন্নত নামে পরিচিত অনেকেই এ সকল কিতাব সমকালীন বিষয় ভিত্তিক শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা কারিকুলামে চালু করেছে। আর প্রাচ্যবিদগণ এ বিষয়কে তাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখে থাকে।

মানব রচিত শিক্ষা প্রণালীর ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান

এখানে সমুচিত মনে করেছি যে, মানবজ্ঞান নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির সাথে মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা ও নীতিগত অবস্থান খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব ও তাদের ধ্যান ধারণা নিয়ে সাহাবীদের জীবনী আলোচনার ভয়াবহ পরিণতির উপর আলোকপাত করব। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ ধরনে শিক্ষা নীতির মূল উৎস হল বিবেক বুদ্ধি, ধর্ম বিশ্বাসের এখানে কোন স্থান নেই। তাই নিম্নে লিখিত কারণে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

প্রথম : মুসলিম কখনো ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ না সে ধর্মত্যাগী না হয়।

দ্বিতীয় : সাহাবীদের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যদি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা পরিলক্ষিত হয় তখন তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোন দৃষ্টিতে করব? যদি এ ক্ষেত্রে আমরা ইসলামী ধ্যান ধারণা পরিহার করি তাহলে অন্য নীতির অনুসরণ করতে হবে ফলে অজান্তে আমাদের বিপথগামী হতে হবে।

---

[৪] الرد على الرافضة : ص: ١٩

[৫] الصارم السلول ص: ٥٨٦

[৬] الصارم السلول ص: ٥٧١

তাই আমাদের জন্য উচিত সাহাবীদের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্যতা এড়িয়ে যাওয়া, এবং এ কথা জেনে রাখা যে, এ ধরনের শিক্ষানীতি নিয়ে সাহাবীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করা মানে প্রবৃত্তি পূজারিদের লিখিত সাহাবীদের সমালোচনায় সত্য বিকৃত বই পুস্তককে সমর্থন করা। সাহাবীদের সমালোচনাকে বিদ্যা চর্চা বলে চালিয়ে দেয়াকে কোন অবস্থাতে সত্যের অনুসন্ধানীগণ মেনে নিবে না। আর এ ধরনের প্রতারণা দ্বারা কলুষিত ইতিহাস কারও নিকট মূল্যায়ন হয় না। যেমন মূল্যায়ন হয় না তাদের সুপ্রসিদ্ধ লেখকের লেখনী দ্বারা। সত্যের অনুসারী সকল মুসলমান এ কথা জানে যে তাদের এসব লেখনীর উদ্দেশ্যই হল হক পন্থীদের প্রভাব থাকাকালীন সময়ে যে কুৎসা সমূহ মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে ওগুলোকে পুনরায় জীবিত করা।[৭] আমি আমার প্রতি ও সাহাবীদের ইতিহাস পর্যালোচনাকারী ভাইদের প্রতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি যে, সাহাবীদের ব্যাপারে প্রথমে আকীদা-বিশ্বাস সুদৃঢ় করবে অতঃপর তাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করবে।

যেমন সাহাবীদের ব্যাপারে এ আকীদা পোষণ করা যে, তারা সকলেই প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী। এমনিভাবে এ আকীদা রাখা যে, ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও তাদের মন্দালোচনা হারাম। সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। তাদের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছিয়েছেন। এবং একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সাহাবীদের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের স্বতন্ত্র মূলনীতি রয়েছে যা এ পুস্তকের শেষাংশে আসবে ইনশা আল্লাহ।

পঞ্চম : আয়েশা রা. কে মন্দ বলার বিধান ঃ

আলেমগণের সর্বসম্মতিক্রমে যে বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা মু'মিন জননী আয়েশা রা. পক্ষে পবিত্রতার কথা বলেছেন সে বিষয়ে পুনরায় তাঁকে অপবাদ দেয়া কুফরী। যে ব্যক্তি এ ধরনের অপবাদ দিবে সে কাফের।

কাজী আবু ইয়ালা রহ. বলেন, যে ব্যাপারে মহান আল্লাহ আয়েশা রা. কে নিষ্পাপ বলেছেন সে বিষয়ে তাঁকে পুনরায় দোষারোপ করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী।

প্রথমত ঃ ইমাম মালেক রহ. হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আবু বকর রা. কে মন্দ বলবে তাকে কোড়া মারা হবে আর যে আয়েশা রা. কে মন্দ বলবে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে আয়েশাকে মন্দ বলল, সে কুরআনের বিরোধিতা করল। আর কুরআনের বিরোধিতা করল তাকে হত্যা করাই শ্রেয়। আল্লামা ইবনে শাবান রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা আয়েশা রা. সম্পর্কে বলেছেন—

يَعِظُكُمَ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . سورة النور ﴿١٧﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি ঈমানদার হও তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না।" সূরা আন-নূর :১৭) সুতরাং যে পুনরায় মা আয়েশাকে দোষারোপ করল, সে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করল আর যে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে কাফের।[৮] মু'মিন জননী আয়েশা রা. কে অপবাদদাতার কাফের হওয়ার প্রমাণাদি একেবারেই সুস্পষ্ট। তন্মধ্যে- ১ম ইমাম মালেক রহ. এর প্রমাণ। তিনি বলেন কুরআন যেহেতু আয়েশা রা. কে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাই তাঁকে অপবাদ দেয়ার অর্থ হল কুরআন বিশ্বাস না করা আর যে কুরআন বিশ্বাস না করে সে কাফের। আল্লামা ইবনে কাছির রহ. বলেন, সমস্ত আলেম এ কথার উপর একমত যে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আয়েশা রা. সপক্ষে যে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে তার পরও তাঁকে মন্দ বলা, অপবাদ দেয়া কুফরী। আর যে এ ধরনের অপবাদ দিবে সে কাফের। কেননা সে কুরআনের বিরোধী।

---

[৭] هذه الفقرة ماخوذة من البحث القيم للدكتور محمد رشاد خليل وفى البحث المذكور ابرز المؤلف المنهج الصحيح للنظر فى تاريخ الصحابة من خلال مذهب أهل السنة.

[৮] الصارم المسلول ص ٥٦٠-٥٦٦ والحبر بسنده فى المحلى ١٨/ ٤١٤-٤١٥

ইবনে হাযম রহ. ইমাম মালেকের মন্তব্য পর্যালোচনায় বলেন, তাঁর কথা সম্পূর্ণ সত্য ; আয়েশা রা.-কে এ ধরনের অপবাদ দেয়া, ধর্ম ত্যাগের শামিল। কেননা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর নিশ্চিত পবিত্রতা ঘোষণার পরও অপবাদ দেয়ার অর্থ হল স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে মিথ্যাচারী বলে সাব্যস্ত করা।

দ্বিতীয়ত : পবিত্র কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী এতে বিভিন্নভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া হয় ও তার মানহানি করা হয়। পবিত্র কুরআন তার প্রমাণ, যেমন সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. বলেন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . سورة النور ﴿٤﴾

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর এর সপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদের আশিটি বেত্রাঘাত কর, কখনো তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাতো ফাসেক।" (সূরা আন-নূর : ৪)

আল্লাহ তাআলার বাণী–

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . سورة النور ﴿٢٣﴾

"যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা মুমিন নারীদের অপবাদ দেয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তারা অভিশপ্ত, তাদের জন্য রয়েছে মহা-শাস্তি।" (সূরা আন-নূর : ২৩)

এ দু আয়াতের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। প্রথম আয়াত সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর দ্বিতীয় আয়াত আয়েশা রা. ও রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা রাসূলের স্ত্রীদেরকে অপবাদ দেবে তারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী, আর যারা অন্য নারীদেরকে অপবাদ দেবে তারা ক্ষমা যোগ্য অপরাধী। সাহাবী ইবনে আব্বাসের এহেন সুন্দর ব্যাখ্যা শুনে জনৈক ব্যক্তির তার মাথায় চুমু খাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন।[৯] ইবনে আব্বাস রা. সুস্পষ্ট বর্ণনা দিলেন যে, দ্বিতীয় আয়াত আয়েশা ও অন্যান্য মু'মিন জননীদের দোষারোপ কারীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর তারা ক্ষমার অযোগ্য এ জন্য যে এতে সূক্ষ্মভাবে রাসূলকে অপমান ও রাসূলের প্রতি অপবাদ দেয়া হয়। কেননা কোন লোকের স্ত্রীকে অপবাদ দেয়ার অর্থ তার স্বামীকে কষ্ট দেয়া ও তার ছেলেকে কষ্ট দেয়া। কারণ এতে স্বামী বা ছেলে দায়ুস (অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট) সাব্যস্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধ্বংস প্রমাণিত হয়। যদি কোন স্ত্রী ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে স্বামী অবর্ণনীয় লজ্জায় পতিত হয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে নিজের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপে যে পরিমাণ লজ্জিত হয় তার চেয়ে বেশি লজ্জিত হয় নিজ স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ দ্বারা।[১০] আর এ কথা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে রাসূলকে কষ্ট দেয়া কুফরী।

বিশিষ্ট তফসিরকারক আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী—

يعظكم الله ان تعودوا لمثله أبدا

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য।" এখানে **لمثله** দ্বারা আয়েশা রা. ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা তার প্রসঙ্গেই আলোচনা চলছে অথবা তার সমমর্যাদা সম্পূর্ণ রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদেরকে বুঝান হয়েছে। যেহেতু এতে রাসূল ও তার স্ত্রীদের মানহানী দ্বারা রাসূলকে কষ্টা দেয়া হয় তাই মহান আল্লাহ চিরকালের জন্য এ ধরনের জঘন্য কাজ থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন।

---

[৯] ইবনে জারির ১৮/৮৩ ইবনে কাছির ৩/২৭৭।

[১০] আচ্ছারেমুল মাসলুল পৃ : ৪৫ কুরতুবি ১২/১৩৯

মু'মিন জননীদের প্রতি অপবাদ আরোপ রাসূলকে কষ্ট দেয়। যার প্রমাণ বুখারী ও মুসলিমে ইফক অধ্যায় বর্ণিত আয়েশা রা.-এর হাদীস। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ বলে আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে শাস্তি প্রয়োগে নিরুপায়ত্ব প্রকাশ করলেন যে–

يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. (رواه البخاري و المسـلم)

"ঐ ব্যক্তির শাস্তি প্রয়োগে কে আমাকে নিরুপায় মনে করবে, যে আমার পরিবারের প্রতি অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে মু'মিন জননীর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তির সম্মুখে নিরুপায় বলে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কাছে যে সে বাস্তবিকেই শাস্তির উপযুক্ত। তাই যদি আমি তাকে শাস্তির সম্মুখীন করি তাহলে কে একে ন্যায় বিচার বলে মেনে নিবে। এ হাদীস এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ যে মু'মিন জননীদের প্রতি অপবাদ রাসূলের কষ্টের কারণ। তাই মু'মিনদের মাঝে যারা স্বজনপ্রীতির স্বীকার হয়নি তারা সকলেই বলে উঠলেন—

مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا بضر أعناقهم.

"হে রাসূল! আপনার অনুমতি পেলে তার গর্দান উড়িয়ে দেব এবং আপনাকে এ নির্দেশের ব্যাপারে নিরুপায় মনে করব।" এ জন্যই তো সাআদ বিন মায়াজ (রা.) তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি চাইলে রাসূল তা অস্বীকার করেনি।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন পূত পবিত্র মু'মিন জননী, রাসূলের স্ত্রীদের প্রতি যে বা যারা অপবাদ আরোপ করে তারা মুনাফেক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবায় বিন সালুলের দলভুক্ত। তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই রাসূল বলেছেন—

يا معشر المسلمين من يعذرني فيمن آذاني في أهلي. رواه البخاري والمسلم

"হে মুসলিম জনতা! যে ব্যক্তি আমাকে আমার স্ত্রী বিষয়ে কষ্ট দিয়েছে তাকে শাস্তির সম্মুখীন করলে কে আমাকে নিরুপায় মনে করবে।"

মহান আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।" সূরা আল-আহযাব : ৫৭-৫৮)

সুতরাং যারা পরবর্তীতে এ ধরনের কোন অপপ্রচার চালাবে মু'মিনদের উচিত তাদেরকে শক্ত হাতে দমন করা ও তাদের প্রতিবাদ করা।[১১] শুধু তাই নয় বরং মু'মিন জননীদের প্রতি এহেন অপবাদ স্বয়ং রাসূলের প্রতি ও জঘন্য অপবাদ, কেননা মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ

"মন্দ নারীগণ মন্দ পুরুষের জন্য।" তাই রাসূলের স্ত্রীগণ যদি মন্দ হয় তাহলে স্বয়ং রাসূল নিজেই মন্দ (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

আল্লামা ইবনে কাছির রহ. বলেন আয়েশা রা. পরিপূর্ণ পূত পবিত্র বিধায় রাসূলের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। কেননা রাসূল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র ব্যক্তি। যদি তিনি অপবিত্র হতেন তাহলে কখনো রাসূলের স্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেত না। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন—

اولئك مبرؤن مما يقولون

[১১] রিসালুতন ফি রাদ্দি আলা রাফিজাহ ২৫,২৬

"অপবাদ আরোপকারীরা যা বলে মু'মিন জননীগণ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলুষ ।[১২]

ষষ্ঠ : অন্যান্য মু'মিন জননীদেরকে মন্দ বলার বিধানঃ

আয়েশা রা. ব্যতীত অন্যান্য মু'মিন জননীদেরকে মন্দ বলার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে । এ ধরনের অপরাধী কাফের । যেহেতু সে রাসূলের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ চাপিয়েছে যা মহান আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ । সুতরাং অপবাদের ক্ষেত্রে আয়েশা ও অন্যান্য স্ত্রী সবই সমান ।[১৩] যা ইতিপূর্বে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়েশরা রা. ব্যতীত অন্যান্য মু'মিন জননীদেরকে এমন মন্দ বলা যা ধর্মীয় ও সামাজিক মান মর্যাদার উপর আঘাত হানে না, তার হুকুম অন্যান্য সাহাবীদের মতই ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে ।

মন্দ বলার পরিণতি

পূর্ব মনীষীগণ সাহাবীদিগকে মন্দ বলার কু-পরিণামের ব্যাপারে সকলকে সজাগ করেছেন । এবং কুচক্রীদের অশুভ অভিপ্রায় সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন, কেননা তাঁরা ভালভাবে জানতেন সাহাবীদের প্রতি অপরাধের পিছনে সে কুচক্রীদের কি মন্দ অভিলাষ লুকিয়েছিল । আর তাহল দীনে ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করা ।

তাই তাদের অনেকেই সংক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ বলেছেন যা আমি এ অধ্যায়ের ভূমিকায় আলোকপাত করব । অতঃপর তার ভয়াবহ পরিণতির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ ।

আমার প্রতিবাদমূলক এ আলোচনা কেন্দ্রীভূত হবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অপবাদীর বিপক্ষে । যারা সব সাহাবী বা অধিকাংশ সাহাবীদেরকে কাফের, ফাসেক বলে । অথবা যারা এমন ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অপবাদ রটায় যাদের মর্যাদার সপক্ষে শরীয়তের ধারাবাহিক প্রমাণাদি রয়েছে । যেমন চার খলীফা । যারা সাহাবীগণকে গালমন্দ বলে, তাদের সম্পর্কে ইমাম মালেক রহ. বলেন তারা প্রথমে রাসূলকে অপবাদ দিতে চেয়েছিল যখন সম্ভব হল না তখন সাহাবীদেরকে অপবাদ দিতে আরম্ভ করল যাতে মানুষ রাসূল সম্বন্ধে এ মন্তব্য করতে পারে যে, লোকটি খুব মন্দ ছিল । অন্যথায় তার সাথিগণ মন্দ হত না ।[১৪]

ইমাম আহমদ রহ. বলেন যদি কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাও যে, সে সাহাবীদের সমালোচনা করছে তাহলে মনে করবে সে মুসলমান নয় ।[১৫]

আবু যুরআহ আর রাজি রহ. বলেন, যদি দেখ কোন ব্যক্তি রাসূলের কোন সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করছে তাহলে মনে করবে যে, সে কাফের নাস্তিক । আর তা এজন্য যে, রাসূলকে সত্য নবী বলে আমরা বিশ্বাস করি, আর কুরআনকে সত্য কিতাব বলে আমরা বিশ্বাস করি, আর রাসূলের বাণী হাদীস ও কুরআন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন সাহাবীগণই, সুতরাং সাহাবীদেরকে অপবাদের উদ্দেশ্য হল কুরআন ও হাদীসকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করা সুতরাং তারা যে নাস্তিক হবে এটাই স্বাভাবিক । ইমাম আবু নাঈম রহ. বলেন সাহাবীদের ভুল ত্রুটির পিছে পড়ো না । সাহাবীগণ শুধু ক্রোধ ও আবেগে যা করেছেন তার পিছে সে সব লোকেরাই পড়ে যাদের অন্তরাত্মা রোগাক্রান্ত ।[১৬] তিনি আরও বলেন রাসূল, সাহাবী, ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে বল্গাহীন কথা বার্তা শুধু সেই বলবে যার অন্তর খারাপ ।[১৭] আলেমগণের ভীতি প্রদর্শন নির্দিষ্ট কোন সাহাবী কেন্দ্রিক নয় বরং এতে সমস্ত সাহাবীই অন্তর্ভুক্ত । আবু যুরআহ রহ. বলেন ينتقص أحدا যে কোন এক সাহাবীকে হেয় প্রতিপন্ন করে । এখানে আলেমগণ শুধু সমালোচনা ও হেয় প্রতিপন্নের উপর ভীতি প্রদর্শন করেছেন । যা তাদেরকে গালি দেয়া ও কাফের বলা থেকে অনেক কর্ম অপবাদ, তাও শুধু যে কোন এক সাহাবীর

---

[১২] ইবনে কাসির ৩/২৭৮

[১৩] আশশেফা ২/১১১৩, আচ্ছাওয়ায়েকুল মুহবাকাহ ৩৮৭, মহল্লি ১১/৪১৫

[১৪] রিছালাতুন ফি হুকমি সাব্বি আসসাহাবা ৪৬, আচ্ছারেম আল-মাসলুল ৫৮০ ।

[১৫] আল বেদায়া ওয়াননেহায়া : ৮/১৪২

[১৬] আল ইমামত লি আনি নাঈম : ৩৪৪

[১৭] আল ইমামাতু লি আবি নাঈম : ৩৭৬

ক্ষেত্রে। এখন ভেবে দেখা উচিত যারা অধিকাংশ সাহাবীদেরকে মন্দ বলে তাদের ব্যাপারে তারা কি বলবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! আপনাদের সমীপে সাহাবীদেরকে মন্দ বলার কিছু কু-পরিণতি তুলে ধরা হল।

প্রথমত : কিছু সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত বাকিদেরকে কাফের, ধর্মত্যাগী বলায় কুরআন ও হাদীসের বিশুদ্ধতার প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। কেননা বর্ণনা কারীর উপর সন্দেহ হলে বর্ণিত বস্তুর উপরও সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাহলে যে কুরআন আমাদের পর্যন্ত কাফের, ফাসেক ধর্ম ত্যাগীগণ পৌঁছিয়েছেন তা সঠিক বলে আমরা কীভাবে মেনে নিব? তাইতো দেখা যায় যারা সাহাবীদেরকে এহেন মন্দ বলে তাদের কেউ কেউ সুস্পষ্ট এ কথা বলে যে, আমাদের কাছে বিদ্যমান কুরআন বিকৃত কুরআন, আবার কেউ কেউ মুখে এরূপ না বললেও অন্তরে এ ধরনের আকীদা রাখে। এমনিভাবে হাদীসের অবস্থাও একই। যদি অধিকাংশ সাহাবীর অবস্থা এই হয় যে, তারা কাফের ফাসেক ধর্মত্যাগী, তাহলে সব হাদীসই مقطوع তথা রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যা কখনও শরীয়তের প্রমাণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এতদ সত্ত্বেও তাদের কেউ কেউ এ দাবি করে যে, তারা কুরআন বিশ্বাস করে। আমরা তাদেরকে বলব, যদি তাই হয় তাহলে কুরআনে যা বলা আছে তাই মানতে হবে। আর কুরআনে আছে 'সাহাবীগণ এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট আছেন। তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছে এবং আল্লাহ তাদের কিয়ামতের দিন অপমান করবেন না।' তাদের সম্পর্কে এত সব শুভ সংবাদের পরও যারা তাদেরকে এ ধরনের মন্দ বলে তারা কুরআন অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা নিজ দাবিতেই মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয়ত : তাদের এ কথা যা দাবি করে তাহল, এ উম্মত নিকৃষ্টতম উম্মত। এদেরকে মানুষের মন্দের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। আর এদের মধ্য হতে প্রথম যুগের মানুষ যাদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়েছে তারাই সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ। কেননা এদের অধিকাংশই কাফের ফাসেক হয়ে গিয়েছে।[১৮] কতই না মন্দ তাদের এহেন মন্তব্য।

তৃতীয়ত : তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এমন দুটি বিষয়ের যে কোন একটি অবধারিত হয় যা আল্লাহর জন্য মোটেই প্রযোজ্য নয়। হয়তো আল্লাহ তাআলাকে অজ্ঞ বলতে হবে, নয়তো সাহাবীদের প্রসঙ্গে প্রশংসা সংবলিত আয়াতসমূহকে অনর্থক বলতে হবে। যদি বলা হয় যে, মহান আল্লাহ এ কথা জানতেন না যে তারা কাফের হয়ে যাবে তাই তাদের প্রশংসা বাণী নাজিল করেছেন ও তাদের সাথে উত্তম প্রতিদানের অঙ্গিকার করেছেন। তাহলে আল্লাহকে অজ্ঞ বলতে হবে যা তাঁর জন্য অশোভনীয় ও অসম্ভব। আর যদি বলা হয়, তারা যে কাফের হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা জানতেন তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি ও তাদের প্রতি সন্তুষ্টির যে ঘোষণা দিয়েছেন তা অনর্থক। আর আল্লাহ তাআলা থেকে অনর্থক কিছু প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব।[১৯] সাথে সাথে মহান আল্লাহ তাআলার কর্ম কৌশলের উপরও অপবাদ আসে, কেননা তাদের মন্তব্য অনুযায়ী মহান আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের সংস্রবের জন্যও তার সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা ও তার আত্মীয়তার জন্য (যেমন সাহাবী ওসমানের রা. নিকট তার দু কন্যাকে বিয়ে দিয়েছেন এবং সাহাবী আবু বকর ও ওমরের রা. দু' কন্নাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং বিয়ে করেছেন) এমন সব লোকদের নির্বাচন করেছেন যারা অচিরেই কাফের হয়ে যাবে। এটা প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষে কীভাবে শোভা পায় ?

চতুর্থতঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জন্য সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন যার ফলে এমন এক জাতি গড়ে উঠেছিল যাদের আল্লাহ ভীরুতা ও দুনিয়া বিমুখ চরিত্র ও ত্যাগ তিতিক্ষা ছিল দৃষ্টান্ত তুল্য। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম প্রশিক্ষক হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ।

[১৮] আসসারেমুল মাসলুল পৃঃ ৫৮৭
[১৯] ইত্তিহাক যাবিন নাজাবা লিখক মুহাম্মদ বিন আরবী পৃঃ ৭৫

কিন্তু এর বিপরীতে একদল লোক যারা নিজেদেরকে রাসূলের সাথে ও ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্টতার দাবি করে অথচ সাহাবীদের সে সোনালি সমাজকে এমন এক বিকৃত আকৃতিতে উপস্থাপন করে যা রাসূলের তেইশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিক্ষা দীক্ষাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। এবং তারা সাহাবীদের সে সোনালি সমাজের এরূপ এক নৈতিক অবক্ষয় প্রমাণ করতে চায় যার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, তাদের নিকট মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন নিষ্ঠাবান সচেতন অভিভাবক আসেনি, যা ছিল এক জন নবীর নৈতিক গুণ।[২০]

ইমামিয়াহ সম্প্রদায় রাসূলের তিরোধানের পর সত্যিকার ইসলামের বিস্তারে বিশ্বাসী। কেননা তাদের ধারণা মতে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বৎসরের পরিশ্রমের ফসল হল তিন চারজন লোক মুসলমান হওয়া বাকি সব তার মৃত্যুর পর ধর্ম ত্যাগী হয়ে যায়। তাদের এ ঘৃণ্য চক্রান্তের উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে, রাসূলের সংস্রব ও তার শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ অকৃতকার্য ও নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে। তার মৃত্যুর পর এর কার্যকারিতার কোন প্রভাব অবশিষ্ট ছিল না।

তাদের এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা মানব সংশোধনে নৈরাশ্যের জন্ম দেয় এবং ইসলামের সুন্দর আদর্শ ও নৈতিক চরিত্র শিক্ষার প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যেহেতু যে ইসলাম তার ধারক বাহক ও তার আহ্বায়কের উপস্থিতিতে এমন এক জাতি উপহার দিতে পারল না যারা হবে সমস্ত পৃথিবীর জন্য দৃষ্টান্ততুল্য, যাদের সমাজ হবে সমস্ত জগৎ বাসীর জন্য অনুসরণীয়। তাহলে কি করে দীর্ঘকাল পর সে ইসলাম অনুসরণ যোগ্য হতে পারে এবং এই দাওয়াতের প্রথম বিশ্বাসীগণ যখন সঠিক পথের উপর স্থির থাকতে পারেনি, পারেনি রাসূলের সাথে কৃত অঙ্গিকার রক্ষা করতে বরং তার মৃত্যুর পর চার জন ব্যতীত সকলই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তাহলে আমরা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, সে ধর্ম মানব জাতির আত্ম পরিশুদ্ধতায় ও চরিত্র গঠনে সফল-সক্ষম হবে এবং অসভ্য বর্বর মানব সমাজকে হেদায়েতের আলো দেখাতে সক্ষম হবে? বরং এ কথাই যুক্তি যুক্ত হবে যে যদি এ ধর্মের আহ্বায়ক সত্যিকারের নবী হতেন, তাহলে তাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিশ্বাসকারীর সু-বিশাল এক জামাআত তৈরি হত, ও তার দাওয়াত ও শিক্ষা, সফল শিক্ষা হত। তাদের ধারণা অনুযায়ী যদি কয়েক জন ব্যতীত সকলেই ধর্ম ত্যাগী কাফের ও মুনাফেক হয়ে যায়, তাহলে সে রাসূল থেকে কে বা কারা উপকৃত হল? আর রাসূল ও বা কেমন করে জগৎ বাসীর জন্য রহমত হলেন?![২১]

সাহাবীদের বিরোধপূর্ণ ঘটনাবলির ব্যাপারে নীরবতা পালন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكر النجوم فامسكوا، وإذا ذكر القدر فامسكوا (الطبراني في الكبير ٢/ ٧٨/ ٢)

যখন দেখ সাহাবীদের সমালোচনা হচ্ছে তখন তুমি নীরব থাক, যখন দেখ নক্ষত্রের সমালোচনা হচ্ছে তখনও তুমি নীরব থাক। যখন দেখ তাকদীর সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তখন তুমি নীরব থাক।”[২২]

রাসূলের এই নির্দেশের আলোকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অভিমত হল সাহাবীদের ভুল ভ্রান্তির ব্যাপারে নীরব থাকা এবং তাদের মাঝে সৃষ্ট ঝগড়া বিবাদকে এড়িয়ে চলা অপরিহার্য। আল্লামা আবু নাঈম রহ. বলেন যে সমস্ত মু’মিনদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[২০] তাদের অনেকেই সুস্পষ্ট এ মন্তব্যও করেছে যে রাসূল সমাজ সংস্কার করণে সফল হন নেই বরং এতে সফল হবে তাদের অদৃশ্য মাহদী। আল্লামা আশকারী লিখিত রাসূল ও রিসালত : ২১২,২১৩

[২১] শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি লিখিত সুরতানে মুতাজাদ্দানে ১৩/৫৩,৫৪,৫৮,৯৯

[২২] তাবরানী ২/৭৮ আবু নাঈম লিখিত আল হুলিয়াতু ৪/১০৮ আসসিলসিলাতুচ্ছাহিহা ১/৩৪

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. سورة الحشر ﴿١٠﴾

"যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর ।"

তাদের লক্ষণ হল, সাহাবীদের সমালোচনায় নীরবতা পালন করা । সাহাবীদের কৃতিত্বে ও উত্তম গুণাবলির ব্যাপক প্রচারে সচেষ্ট থাকা এবং তাদের কৃতকর্মকে সুন্দর আঙ্গিকে উপস্থাপন করা । তিনি উল্লিখিত হাদীস প্রসঙ্গে আরও বলেন আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে সাহাবীদের ভুল ভ্রান্তির সমালোচনা করতে, সমালোচনা করতে সে সব বিষয়ের যা তারা আবেগ বা ক্রোধের বশীভূত হয়ে করেছেন ।[২৩] হাদীসে যে নীরবতার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হল সাহাবীদের মাঝে পরস্পর যে কলহ বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ ও মতানৈক্য হয়েছে তার সমালোচনা না করা, সাধারণ জনগণের সামনে তা তুলে না ধরা, এগুলোকে কেন্দ্র করে সাহাবীদেরকে অপমান না করা এবং এর মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদেরকে সাহায্য না করা ।[২৪] কেননা এ ধরনের কাজের প্রতি আমরা আদিষ্ট নয় বরং আমরা আদিষ্ট হয়েছি তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখতে ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং তাদের কৃতিত্ব ও মর্যাদাকে ব্যাপক প্রচার প্রসার করতে । কিন্তু যখন কোন ভ্রান্ত মতাবলম্বী তার ভ্রান্ত আকীদা দ্বারা সাহাবীদের মর্যাদায় আঘাত হানে তখন অবশ্যই ইলম ও ইনসাফের সাথে সাহাবীদের সে সব গুণাবলির আলোচনা করতে হবে যার দরুন তাদের এসব প্রমাণাদি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় ।[২৫] বর্তমান যুগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কেননা মুসলমানগণ সাধারণ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন সিলেবাসের শিকার, বস্তুবাদী আর ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের শিক্ষা পরিত্যাগ করে সাহাবীদের মাঝে ঘটিত বিরোধপূর্ণ ঘটনাবলির অশালীনভাবে খোঁজা-খুঁজি করছে । দুঃখজনক হলেও সত্য যে সাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া কলহ বিবাদ নিয়ে মন্দ ধ্যান-ধারণা মুসলমানদের মাঝেও সংক্রামিত হয়েছে । যার ফলে তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে সবল ও দুর্বল বর্ণনাকে একীভূত করে ফেলেছে । বিজ্ঞ আলেমগণের মতাদর্শ ছাড়া নিজের পক্ষ থেকেই সে ব্যাপারে হুকুম জারি করেছেন । তাই আমি সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা বিশেষ প্রয়োজনে সাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চায় বিশেষ কিছু মূলনীতি তৈরি করেছি যা তাদের জন্য যেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরি ।

সাহাবীদের ইতিহাস গবেষণার মূলনীতি সমূহ

প্রথমতঃ সাহাবীদের মাঝে ঘটে যাওয়া ঝগড়া বিবাদ ঘাঁটা ঘাটি করা ও কাদা ছোঁড়া ছুঁড়ি করা ইসলামের মূলনীতি নয় । বরং ইসলামের মূলনীতি হল এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করা যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের কিতাব সমূহে সবিস্তারে বর্ণিত আছে । যেমন সুনানে আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল, সুনানে ইবনে আবি আছেম, আল্লামা ছাবুনি লিখিত আকীদাতু আসহাবিল হাদীস, ইবনে বত্তা লিখিত আল ইবানাহ, ইমাম তাহাবি লিখিত আকীদাতুত ত্বাহাবিয়াহ ইত্যাদি । এবং এ নীরবতা ঐ ব্যক্তির জন্য বেশি জরুরি যার উপর ভাল মন্দ সংমিশ্রণ, গোলমাল ও ফেতনার আশঙ্কা হয় । আর এ সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণ হল–

সাহাবীদের মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বয়সে স্বল্পতা, ইসলামে নব দীক্ষা ইত্যাদি । যার কারণে তারা সাহাবীদের মাঝে মত বিরোধের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে ব্যর্থ । তাই অজান্তে সাহাবীদের মর্যাদা হানিরকরে থাকে অথচ সে অনুধাবনও করতে পারে না ।

---

[২৩] আল ইমামাহ : ৩৪৭

[২৪] মানহাজে কিতাবাতুত তারিখুল ইসলামী (মুহাম্মদ বিন ছামেল) ২২৭, ২২৮

[২৫] মানহাজুজ সুন্নাহ ৬/২৫৪

পূর্ববর্তী আলেমদের সর্বজন স্বীকৃত একটি মূলনীতি হল—মানুষের নিকট শুধু শরীয়তের সে সব হুকুমই বর্ণনা করবে যা বুঝতে তারা সক্ষম। ইমাম বুখারি রহ. এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় তৈরি করেছে। তিনি লিখেছেন—

باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمون (فتح الباري: ١/ ١٩٩ صحيح البخاري، ١/ ٤١ كتاب العلم باب رقم (٤٩) ط تركيا)

অর্থাৎ—'কোন বিষয়কে নির্দিষ্ট কোন সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশ করা আর না বুঝার আশঙ্কায় অন্যদের কাছে গোপন রাখা প্রসঙ্গে'। সাহাবী আলী রা. বলেন, শ্রোতার জ্ঞান অনুপাতে কথা বল, তুমি কি চাও সে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল কে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করুক? হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রহ. সাহাবী আলীর রা. কথা সম্পর্কে বলেন এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, متشابهة তথা অস্পষ্ট বিষয়সমূহ সাধারণ মানুষের সামনে আলোচনা করা অনুচিত। এমনি ভাবে সাহাবী ইবনে মাসউদ রা. বলেন যদি তুমি কোন সম্প্রদায়কে এমন সূক্ষ্ম কথা বল যা বুঝতে তারা অক্ষম, তাহলে মনে রাখবে এটা তাদের অনেকের জন্য ফিতনার কারণ হবে।[২৬] এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ রহ. রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অধ্যায়, আর ইমাম মালেক রহ. আল্লাহর গুণাবলির অধ্যায় এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. غرائب তথা অসহজসাধ্য অধ্যায় খুব গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং এ প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র মূল নীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তাহল যে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বেদআতকে সমর্থন করে অথচ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, তাহলে এমতাবস্থায় সে হাদীসটি এমন ব্যক্তির নিকট না বলা যে হাদীসের বাহ্যিক অর্থকেই মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করবে।

দ্বিতীয়ত ঃ - যদি বিশেষ প্রয়োজনে সাহাবীদের মাঝে সংঘটিত ঝগড়া বিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয় তাহলে প্রথমে তাদের মাঝে সংঘটিত ব্যাপারটি সূক্ষ্মভাবে নিশ্চিত তদন্ত করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. سورة الحجرات ﴿٦﴾

"হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতা বশত : তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হতে হয়।" (সূরা আল-হুজরাত : ৬)

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন পাপাচারীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের যেন উপযুক্ত তদন্ত করা হয় যাতে সে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে পরক্ষণে তার জন্য লজ্জিত না হতে হয়। আর সাহাবীগণ যেহেতু উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি তাহলে তাদের ব্যাপারে প্রাপ্ত সংবাদের সুষ্ঠু তদন্ত অতিশয় জরুরি।

আর এ কথাও আমাদের অজানা নয় যে, এ প্রসঙ্গে যত বর্ণনা রয়েছে অধিকাংশগুলোতে মিথ্যা ও বিকৃতি অনুপ্রবেশ করেছে, হয় মূল সূত্রে না হয় বাড়ানো কমানোর মাধ্যমে। যার কারণে এ সব বর্ণনা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এবং প্রসঙ্গে যত বর্ণনাকারী রয়েছে সবগুলো মিথ্যাবাদী বলে প্রসিদ্ধ। যেমন আবু মুখান্নাফ লুতবিন ইয়াহইয়া এবং হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন আসসায়েব আলকালাবী প্রমুখ।[২৭]

তাই সাহাবীদের মানমর্যাদা সম্পর্কে যে সব বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে সে গুলোকে কোন অবস্থাতেই এ সব দুর্বল বর্ণনা দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না যে এগুলোর বর্ণনার ধারাবাহিকতা রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন বা এগুলো সম্পূর্ণ বিকৃত অথবা এগুলোর ভিত এত নড় বড়ে যে ঐগুলি দ্বারা বিশুদ্ধ হাদীসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোটেই সম্ভব নয়। সাহাবীদের মর্যাদার ব্যাপারে এত অধিক হাদীস পাওয়া যায় যা দ্বারা

[২৬] মুসলিম ১/১১ জামেউল উসুল ৮/১৭
[২৭] মানহাজুস সুন্নাহ ৫/৭২

তাদের মর্যাদা আমাদের অন্তরে يقين তথা নিশ্চিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যাকে কোন সন্দেহযুক্ত বা দুর্বল বর্ণনায় ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। কেননা এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিশেষ মূলনীতি রয়েছে। اليقين لا يزول بالشك অর্থাৎ নিশ্চিত বিষয় কখনো অনিশ্চিত বিষয় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সুতরাং যে স্থানে সন্দেহের এ অবস্থা সেখানে যদি বাতিল প্রমাণিত কথা হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই।[২৮]

তৃতীয়ত :- সাহাবীদের সমালোচনা সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীস যদি সত্য অসত্যের মানদণ্ডে শুদ্ধ প্রমাণিত হয় ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থে তাঁরা অপরাধী প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের নিরপরাধী ও নির্দোষী হওয়ার উত্তম পথ খুঁজে বের করবে।

ইবনে আবি সাইদ রহ. বলেন সাহাবীগণ একথার বেশি হকদার যে তাদের মাঝে ঘটিত ঝগড়া বিবাদ সম্পর্কে নীরবতা পালন করবে এবং তাদের ভুল ত্রুটি গুলোকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাদের ব্যাপারে ভাল ধারণা রাখবে।[২৯]

আল্লামা দাকিকুল ঈদ রহ. বলেন সাহাবীদের মত বিরোধ ও ঝগড়া বিবাদ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভ্রান্ত যে বর্ণনাবলি রয়েছে সে গুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপ করারও প্রয়োজন নেই। আর এ ব্যাপারে যে বিশুদ্ধ বর্ণনাবলি রয়েছে সে গুলোর অতি সুন্দর মার্জনীয় ব্যাখ্যা করবে, কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রশংসা, সমালোচনীয় বিষয়াদির বহু পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়াও সমালোচনীয় বর্ণনাগুলোর একাধিক অর্থ ও একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে যা কোন নিশ্চিত সাব্যস্ত বিষয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।[৩০]

সাহাবীদের সমালোচনীয় বিষয়ে যত বর্ণনা রয়েছে সব কয়টির ক্ষেত্রে এ মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

চতুর্থতঃ সর্বজন স্বীকৃত ইতিহাসের পাতায় সাহাবীদের যে বিশেষ মত বিরোধ রয়েছে সে গুলোর ব্যাপারে তারা মুজতাহিদ তথা সত্য উদ্ঘাটনে সাধনাকারী। ব্যাপারটি ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট তাই তারা এ ক্ষেত্রে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রথম শ্রেণি: যাদের এ কথা বোধগম্য হয়েছে যে খলীফা ন্যায়ের পথে আছেন আর অপরপক্ষ বিদ্রোহী তাই তাদের ইজতিহাদ মতে বিদ্রোহীকে দমন করে খলীফাকে সাহায্য করা ওয়াজিব। সুতরাং তারা তাই করেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণি: যারা বর্ণিত শ্রেণির সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তাদের ধারণা মতে খলীফা বিরোধীগণ ন্যায়ের উপর আর খলীফা অন্যায়ের উপর। সুতরাং খলীফা বিরোধীগণকে সাহায্য করা তাদের উপর কর্তব্য সেজন্য তারা তাই করেছেন।

তৃতীয় শ্রেণি: যাদের নিকট ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ঘোলাটে ছিল। উভয় পক্ষের কাউকে ভুল আর কাউকে শুদ্ধ বলে মন্তব্য করতে একেবারেই অক্ষম ছিল। তাই তারা একাকিত্ব গ্রহণ করেছেন। যেহেতু নিশ্চিত উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা হারাম, তাই তারা তাদের জন্য একাকিত্বকে ওয়াজিব মনে করেছেন।[৩১] যেহেতু এ যুদ্ধ বিগ্রহ ও মতপার্থক্যের বিশেষ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে এবং তারা সবাই নিজেকে সঠিক পথে বলে ধারণা করেছেন তাই তাদের কাউকে অপরাধী বলা ঠিক হবে না। বরং তাদের সবাইকে ইলমে ফেকহায় মুজতাহিদ এর ন্যায় পুণ্যবান বলতে হবে অর্থাৎ যাদের ইজতিহাদ শুদ্ধ হয়েছে তারা দু' পুণ্যের অধিকারী আর যারা ভুল করেছে তারা এক পুণ্যের অধিকারী। এখানে আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাদের এসব যুদ্ধ বিগ্রহ আর মতপার্থক্য ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে ছিল না বরং তা ছিল নিছক খলীফা উসমানের প্রতিশোধ গ্রহণের পদ্ধতি। নিরূপণে, অন্যথায় উষ্ট্রীর যুদ্ধের মহা নায়ক তালহা ও যুবায়ের রা. কখনো খেলাফতের দাবিদার ছিলেন না। এমনি ভাবে সিফফিন যুদ্ধের মহানায়ক মুয়াবিয়া রা. আলীর রা. বিপক্ষে খেলাফতের দাবিদার ছিলেন না। তাদের ধারণা মতে এ লড়াই ছিল ইনসাফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

[২৮] মানহাজুস সুন্নাহ ৬/৩০৫

[২৯] ইবনে আবি যাইদ লিখিত মুকাদ্দাতু বিসালাহ ৮

[৩০] আব্দুল আজিজ আল আজলানী লিখিত আসহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া মাযহাবুননাস।

[৩১] মসলিম বি শরহে নববী- ১৫/১৪৯ ১৮/১১ আল ইসাবা ২/৫০১,৫০২ ফাতহুল বারী ১৩/৩৪ ইয়াহয়ায়ে উলূমিদ্দিন ১/১০২

দমন। বাস্তবেই যদি ব্যাপারটি এমন হয় তাহলে তা একটি গ্রহণযোগ্য কথা, যেহেতু তারা প্রকৃত সত্যকে না মেনে অন্যায়ের আনুগত্য করে চলছে, তাই তাদের ফিরিয়ে আনা জরুরি। এতে বুঝা যাচ্ছে তাদের এ মতপার্থক্য আর কলহ বিবাদ ইসলামী কোন মৌলিক বিষয় নিয়ে ছিল না।[৩২] আমর বিন শাবাহ রহ. বলেন এ কথার কোন প্রমাণ নেই যে মু'মিন জননী আয়েশা রা. ও তার সমমনা যারা ছিলেন তাদের কেউ ক্ষমতা নিয়ে আলীর রা. সাথে বিবাদ করেছেন বা তাদের কেউ খেলাফতের দাবি করেছেন বরং আলীর রা. উপর তাদের ক্ষোভ ছিল এই যে, তিনি কেন মজলুম উসমানের হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করছেন, কেন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছেন না?[৩৩]

আল্লামা যাহাবি রহ. এর অভিমত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যার বিবরণ এই যে, আবু মুসলিম আল খাওলানী রহ. ও তার সাথে কিছু লোক সাহাবী মুআবিয়ার রা. নিকট গেলেন, অতঃপর বললেন আপনি কি আলী রা. এর সম পর্যায়ের? না তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যার কারণে খেলাফতের দাবি করেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি কখনো শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিনি। তিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই আমার চেয়ে খেলাফতের বেশি উপযোগী কিন্তু তোমরা জান যে খলীফা উসমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আর আমি তার ফুফাত ভাই তাই আমি তার রক্তের প্রতিশোধ চাই। সুতরাং তোমরা আলীর নিকট গিয়ে ওসমানের হত্যাকারীদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করতে বল, তাহলে আমি তার আনুগত্য স্বীকার করব। তারপর তারা আলীর নিকট এসে এ প্রসঙ্গে কথা বললেন কিন্তু এতে আলী রা. অস্বীকৃতি জানালেন।[৩৪] ইবনে কাসিমের এক বর্ণনায় আছে এতদ শ্রবণে সিরিয়াবাসীগণ সাহাবী মুআবিয়ার রা. সপক্ষে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৩৫] আর আমাদের একথাও জেনে রাখা উচিত যে, খলীফা আলী রা. ও মুআবিয়া রা. এর মাঝে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তাতে বিশিষ্ট সাহাবীসহ অধিকাংশ সাহাবীগণ অংশ গ্রহণ করেন নাই। যেমন ইমাম আহমদ রহ. এর পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ বিন শিরিন থেকে আইয়ুব সখতিয়ানী তার থেকে ইসমাইল বিন আইলাহ তার থেকে আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, ফিতনা যখন প্রজ্বলিত হল তখন প্রায় দশ হাজার সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন কিন্তু তাদের একশত ব্যক্তিও তাতে অংশ গ্রহণ করেন নেই বরং ত্রিশ জন ও নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন উল্লিখিত বর্ণনাটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শুদ্ধ বর্ণনা আর মুহাম্মদ বিন শিরিন সর্ব শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী তার মারাসিলগুলো সবচেয়ে শুদ্ধ মারাসিল।[৩৬] গবেষকদের উচিত তারা যেন এ সমস্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলো ভাল ভাবে অবলোকন করেন যাতে তারা ঐতিহাসিকদের প্রতারণা দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজেদের মস্তিষ্ককে কলুষিত না করে ও তাদের হীনম্মন্যতা দ্বারা বিশুদ্ধ বর্ণনার অপব্যাখ্যা না করে।

পঞ্চমত: মু'মিনদের এ কথা জানা থাকা আবশ্যক যে সাহাবীদের মাঝে যে যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে তা ইজতিহাদ ও বিশেষ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হলেও সাহাবীগণ এতে দারুণভাবে লজ্জিত ও ব্যথিত হয়েছেন। তাদের ধারণায়ও আসে নেই যে, ব্যাপারটা এত দূর গড়াবে। এবং তারা যখন সাথি সাহাবী ভাইদের মৃত্যুর সংবাদ ফেলেন তখন তারা অবর্ণনীয় মর্মাহত হয়েছেন। তাদের অনেকেই কল্পনাও করতে পারেন নাই যে, বিষয়টি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌছাবে।

নিম্নে তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল।

আল্লামা যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত মু'মিন জননী আয়েশা রা. বলেন আমার ধারণা ছিল যে, আমার অবস্থান মানুষের মাঝে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাবে আমি ভাবতেও পারি নাই যে মুসলমানদের মাঝে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটবে যদি জানতাম তাহলে কখনও এ অবস্থান নিতাম না।[৩৭]

মু'মিন জননী আয়েশা রা. যখন আল্লাহর বাণী-

[৩২] মানহাজুজ সুন্নাহ ৬/৩২৭
[৩৩] আমর বিন শাবাহ লিখিত আখবারুল সবসা ১৩/৫৬
[৩৪] আল্লামা জাহাবী লিখিত সিয়ারুল আ'লামুন নাবলা ৩/১৪০
[৩৫] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৩২
[৩৬] মানহুজুজ সুন্নাহ ৬/২৩৬, ২৩৭
[৩৭] মাগাজিউজ জুহুরী ১৫৪

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. سورة الأحزاب ﴿٣٣﴾

"মু'মিন নারীগণ তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে।" পাঠ করতেন তখন এত বেশি ক্রন্দন করতেন যে তার ওড়না পর্যন্ত ভিজে যেত।[৩৮]

আল্লামা শা'বি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, খলীফাতুল মুসলিমীন আলী রা. যখন সাহাবী তালহা রা. কে মৃত্যু অবস্থায় দেখতে ফেলেন তখন তার মুখ থেকে ধুলি মুছতে ছিলেন ও বলতে ছিলেন আবু মুহাম্মাদকে এভাবে খোলা আকাশের নীচে পড়ে থাকতে দেখা আমার জন্য অসহ্য, অতঃপর বললেন আমার এহেন দুঃখ কষ্টের জন্য সমস্ত অভিযোগ মহান আল্লাহ তাআলার নিকটই পেশ করছি তার পর তিনি ও তার সাথিগণ সকলেই ডুকরে কেঁদে ফেললেন এবং তিনি আক্ষেপ করে বললেন হায় যদি আমি এর থেকে বিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণ করতাম তাহলে কতই না ভাল হত। [৩৯]

খলীফাতুল মুসলিমিন আলী রা. আরও বলতেন, হে হাসান! হে হোসাইন! তোমার পিতা কখনও এ ধারণা করে নেই যে, ব্যাপারটি এত দূর গড়াবে যার কারণে তোমার পিতা আজ থেকে বিশ বৎসর পূর্বে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছে।[৪০]

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও সাহাবী সাআদ বিন মালেক তারা দুজনেই সিফফিনের যুদ্ধে অংশ না নিয়ে একাকিত্ব গ্রহণ করেছেন তাই আলী রা. যুদ্ধ কালীন অবস্থায় আফসোস করে বলতেন তারা দুজন কতই না সুন্দর কাজ করেছেন- যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করাটাই সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তারা অনেক পুণ্যের অধিকারী। আর যদি তা অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধ খুবই নগণ্য। এটা হল সে আলী রা. এর বক্তব্য যার ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অভিমত হল তিনি সত্যের নিকটতম ছিলেন।[৪১]

যুবায়ের বিন আওয়াম রা. যিনি মু'মিন জননী আয়েশার রা. সপক্ষে যুদ্ধ করছিলেন, বললেন এ যুদ্ধ ঐ সব ফেতনা যা নিয়ে আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম এতদ শ্রবণে তার আজাদ কৃত গোলাম বলল, আপনি নিজেই এতে অংশ গ্রহণ করেছেন আবার আপনিই একে ফেতনা বলে আখ্যায়িত করছেন। যুবায়ের রা. বললেন আফসোস আমি অন্যকে আলোর সন্ধান দেই কিন্তু আমি নিজেই আলো দেখি না। আমি যে দিকেই তাকাই শুধু ফেতনাই দেখি তাই আমি এ পথে অগ্রসর হয়েছি, জানি না ভাল করেছি না মন্দ করেছি।[৪২] যে মুআবিয়া রা. আলী রা. সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তার নিকট যখন আলী রা. এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছাল তখন তিনি সাথে সাথে বসে পড়লেন এবং বললেন إنا لله وإنا أليه راجعون অতঃপর ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন এ অবস্থা দেখে তার স্ত্রী বলল, কাল তার সাথে যুদ্ধ করেছ আর আজ তার জন্য কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে যাচ্ছ! উত্তরে তিনি বললেন, মানুষ যে তার জ্ঞান বুদ্ধি ও মান, মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে সে জন্য আমি কাঁদছি। অন্য বর্ণনায় আছে তিনি বললেন, তুমি কি জান মানুষ কি জ্ঞান-বিজ্ঞান আর মান মর্যাদা হারিয়েছে?[৪৩]

বড় আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাদের সপক্ষে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে তথাপিও ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট, তাহলে এহেন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সমালোচনা করা কেমন করে শোভা পায়, আর এ ব্যাপারে তারা ছিলেন ইজতিহাদকারী তাই তাদের মধ্য হতে যারা শুদ্ধ করেছে তারা দু' পুরস্কার পাবে আর যারা ভুল করেছে তারা এক পুরস্কার পাবে, তার পরে ও তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া বিষয়ের জন্য তারা লজ্জিত ও মর্মাহত হয়ে আল্লাহর নিকট তাওবা করেছেন। আর যে সব দুঃখ কষ্ট তাদের উপর অতিবাহিত হয়েছে তার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন ও তাদের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير في الأرض وليس عليه خطيئته

---

[৩৮] সিয়ারু আ'লাম আননাবলা-২/১৭৭
[৩৯] ইবনুল আসির লিখিত উসদুল ঘায়াহ ৩/৮৮,৮৯
[৪০] মানহাজুজ সুন্নাহ ৬/২০৯
[৪১] ফাতহুলবারী ২২/৬৭
[৪২] তারিখে তাবারি ৪/৪৭৬
[৪৩] আল বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ ৮/১৫-১৩৩

"অনেক সময়ে মু'মিনের উপর লাগাতার বিপদ আসতেই থাকে, যাতে জীবন্ত অবস্থায় তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।"[৪৪]

যদি একথা মেনেও নেওয়া হওয়া যে তাদের কেউ কেউ নিশ্চিত অপরাধী ছিলেন তাহলেও তাদের ব্যাপারে কমপক্ষে এ কথাটুকু মানতেই হবে যে মহান আল্লাহ তাদেরকে বহুবিদ কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন ঈমানে অগ্রণী, ঈমানের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও কষ্ট ক্লেশ সহ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ ও তাওবা ইস্তিগফার যা দ্বারা মহান আল্লাহ তাআলা গুনাহগুলোকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর এ ধরনের তাওবার সৌভাগ্য মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

ষষ্ঠত : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা এই যে, যে সমস্ত সাহাবী ছোট বড় সব ধরনের গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র নয় বরং তাদের কেউ অপরাধী হতেও পারে তবে তাদের যে ঈমানে অগ্রণীও অন্যান্য মর্যাদা রয়েছে সে জন্য তারা ইনশাআল্লাহ ক্ষমা পেয়ে যাবে। তথাপিও তাদের মাঝে যখন আল্লাহর ভয় বিদ্যমান ছিল, তাই যদি তাদের কোন গুনাহ হয়েও যায়, তাহলে হয়তো সে গুনাহ থেকে তাওবা করেছেন। অথবা এমন কোন ভাল আমল করেছেন যা সে গুনাহকে মুছে ফেলেছে অথবা ঈমানে অগ্রণীর কারণে সে ক্ষমা পেয়ে যাবে অথবা রাসূল তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করবেন আর তারাই রাসূলের সুপারিশ পাওয়ার বেশি হকদার। অথবা দুনিয়াতে তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে তার উপর ধৈর্য ধারণ করে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছেন তাহলে ভেবে দেখা উচিত, নিশ্চিত গুনাহ থেকে নিষ্কৃতির এত উপায় থাকলে যে বিষয়ে তারা ইজতিহাদকারী সে বিষয়ের অবস্থা যেখানে ভুল করলেও এক নেকি আর শুদ্ধ করলে দু নেকি, সেখানে কি ক্ষমার ব্যবস্থা নাই? তারপরও বলব তাদের দ্বারা যে অপরাধ হয়েছে, তা তাদের দৃঢ় ঈমান, নিখুঁত ইলম ও আমলের তুলনায় খুবই নগণ্য মার্জনীয় যেহেতু তাদের অনেক মান ও মর্যাদা, ত্যাগ তিতিক্ষা রয়েছে যেমন ইসলামের জন্য হিজরত, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ইত্যাদি।[৪৫]

আল্লামা যাহাবি রহ. বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ইবাদত ও ইসলামের অন্যান্য খেদমত ইত্যাদি গুনাহ ক্ষমার উপায়। আমরা তাদের ব্যাপারে সীমা-লঙ্ঘন করি না ও তাদেরকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপও বলি না।[৪৬]

তবে আমরা তাদেরকে ইনসাফগার ও ন্যায়পরায়ণ মনে করি, যার জন্য সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া জরুরি নয়। ইনসাফগার বলতে বুঝায় স্বভাব চরিত্র ও ধর্ম কর্মে ঠিক থাকা। যার মধ্যে এগুণগুলো আসবে তার ভিতর আল্লাহভীতি ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হবে, যার কারণে তার ঈমান শক্তিশালী হবে। তবে এই ইনসাফের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া জরুরি নয়।[৪৭] ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে যে, সাহাবীদের সমালোচনা করা মোটেই জায়েজ নয়, একান্ত প্রয়োজনে যদি তাদের ভুল ক্রুটির পর্যালোচনা করতে হয় তাহলে সাথে সাথে ঈমানে অগ্রণী ও জিহাদ তাওবার আলোকে তাদের ধর্মীয় মর্যাদাও বর্ণনা করতে হবে। যেমন সাহাবী হাতেব বিন আবি বালতাআ রা. থেকে একটি পদস্খলন ঘটেছিল কিন্তু পরক্ষণে তিনি এমন খাঁটি তাওবা করেছেন যা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এখন যদি কেউ তার এহেন তাওবার কথা আলোচনা না করে শুধু তার পদস্খলনের কথা আলোচনা করে তাহলে এটা তার জন্য বৈধ হবে না।[৪৮]

তাই মানুষের জীবনে ছোট খাট যে ভুল ভ্রান্তি হয়েছে পরক্ষণে তা থেকে তাওবা করেছে সংগত কারণেই তার আলোচনা করাই উচিত। কেননা অসম্পূর্ণ সূচনা দেখার বিষয় নয়, শুভ পরিণামই লক্ষণীয়- যদিও কেউ তার সাফায়ী না গায়। আর যদি তার সাফায়ী গায়, মহান আল্লাহ তাআলা যার আছে অদৃশ্যের জ্ঞান তাহলে তো আর কোন কথাই নেই।

---

[৪৪] তিরমিযি হাদিস নং ২৩৯৮

[৪৫] খলিল হেরাস লিখিত শরহে আক্বিদাতুল ওয়াসেতিয়য়াহ।

[৪৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৯৩

[৪৭] আল্লামা গাজ্জালী লিখিত আলমুস তাসফা

[৪৮] আবু নাঈম লিখিত আল ইমামাহ ৩৪০,৩৪১ মানহাজুস সুন্নাহ ৬/২০৭

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سورة الحشر﴿١٠﴾

"হে আমাদের পালনকর্তা আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা তুমি দয়ালু পরম করুণাময়।"

হে আল্লাহ সাহাবীগণকে ভালবাসার ও তাদের উপর আরোপিত অপবাদের প্রতিরোধ করার এবং তাদের প্রশংসা করার ও তাদের নীতি-আদর্শ অনুসরণ করার সৌভাগ্য দান কর।

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم

المملكة العربية السعودية – الرياض
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالربوة
٢٠٠٩م – ١٤٣٠هـ

﴿ اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد بن عبد الله الوهيبي

ترجمة : شهاب الدين حسين

مراجعة : كوثر بن خالد

حقوق الطبع والنشر لعموم المسلمين